অনির্বাণ

(চিত্রোপন্যাস)

শ্রীঅপ্রকাশ মিত্র
বিরচিত

প্রকাশক
শ্রীরাধারমণ দাস
ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস
[illegible]নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য তিন টাকা

ফাইন আর্ট প্রেস
৬০নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীরাধারমণ দাস
কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

উপন্যাসখানি লিখিয়া এম্‌পী প্রোডাকসনের অধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের হাতে দিই ফিল্মে যদি এটিকে রূপান্তরিত করেন, এই অভিপ্রায়ে। মঞ্জুর করিয়া রচনাটি তিনি প্রতিভাধর পরিচালক শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের হাতে দেন। চিত্র-রূপায়নের জন্য পরিচালক মহাশয়ের নির্দ্দেশে উপন্যাসের কতক পরিবর্ত্তন, কতক পুনর্লিখন করিয়াছি।

স্বদেশ-ভক্তির নামে ফিল্মের গল্পে সম্প্রতি অসঙ্গত ও অর্থহীন প্রগলভতা দেখিয়া যথাসম্ভব সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এবং ঘটনা ও চরিত্রাদির স্বাভাবিক পরিণতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই উপন্যাসখানি লিখিয়াছি। সস্তা হাততালির মোহে বিভ্রান্ত হই নাই। এখন এই উপন্যাস ও ইহার চিত্র-রূপায়ণ যদি সকলের ভালো লাগে, তবেই কৃতার্থ হইব। দোষ-ত্রুটি নাই, এমন কথা বলি না,—তবে লেখকের প্রথম রচনা বলিয়া সে-সব ত্রুটির জন্য সবিনয় মার্জ্জনা প্রার্থনা, আশা করি, না-মঞ্জুর হইবে না। ইতি

শ্রীঅপ্রকাশ মিত্র

কলিকাতা

ফাল্গুন ১৩৫৪

শ্রীযুক্ত মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়

করকমলেষু

শ্রীঅপ্রকাশ মিত্র

কলিকাতা
ফাল্গুন ১৩৫৪

তবে যারা সোম্-বছর ফাঁকি দেছ, ভগবান তাঁদের কিছু করতে পারেন না···আমরা তো কীটস্য কীট !

বড় বাবুর অফিসের সঙ্গে ছেলেদের খুব ভাব···সুখে-দুঃখে, অফিসের বাবুরা ছেলেদের সহায় চিরদিন। বোধ হয় ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই দুপক্ষে সম্পর্ক এমনি ডোরে বাঁধা রয়ে গেছে···মন্ত্র-পড়া বিবাহের স্বামী-স্ত্রীর নিবিড় অচ্ছেদ্য বন্ধনের মতো !

ছেলেদের বহু অনুনয় বহু অনুরোধ দাবিয়ে রেখে বড় বাবু বার করে দিলেন কালিদীনের হাতে পাশের লিষ্ট। কালিদীন অত্যন্ত ত্বরিত হাতে সে-লিষ্ট দিলে অফিসের বোর্ডে এঁটে।

লিষ্ট আঁটার সঙ্গে সঙ্গে সুরু খুব খানিকটা হট্টগোল !

—আরে, যা ভেবেছি তাই! মহিমচন্দ্র রায় ফার্ষ্ট···এ্যাণ্ড ইন অল্ সাবজেক্টস্ !

—মেডিসিনের মার্কটা নামের সঙ্গে লিখে দেওয়া হয়েছে! বাহোয়া !

—এ নিউ ডিপার্চার···

বড় বাবু বললেন—মহিম এত নম্বর পেয়েছে মেডিসিনে যে কর্ণেল চৌধুরী দেখে বললেন, ইউনিক রেকর্ড !

—হুঁ···

—মহিম···মহিম···মহিম রায়···

দারুণ একটা উত্তেজনা।···মহিম একটু লাজুক-ধরণের···চুপচাপ থাকে···কলেজের পড়াশুনা করে··· ডিউটি সারে। সকলের সঙ্গে সে মেলামেশায় অমায়িক, মিষ্ট-মধুর ব্যবহার···মুখে হাসিটুকু লেগে আছে সব সময়ে। প্রোফেশররা বলেন, আইডিয়াল ছেলে! বন্ধু আর সতীর্থের দল বলে,—এ্যাডমিরেব্‌ল্ মহিম! অর্থাৎ মহিমকে কলেজের

সকলে চেনে, সকলে জানে, সকলে ভালোবাসে। চীৎকার করে সকলে ধরে আনলো মহিমকে···বোর্ডের সামনে। চার-পাঁচ জনে মিলে তাকে পাঁজাকোলা করে তুললো বললে,—তুমি আমাদের মনুমেণ্ট···গ্লোরিয়স মনুমেণ্ট!

এ দৌরাত্ম্যে বেচারী মহিম একেবারে এতটুকু! লজ্জায় জড়সড়··· বললে,—নামিয়ে দাও ভাই, নামিয়ে দাও। করছো কি!

বন্ধুরা বললে—ইউ হ্যাভ্ টপ্‌ড্ দী লিষ্ট! আমরাও তাই টপিং হেড্ করছি।

সকলে ধরলো—খাইয়ে দাও মহিম···খাইয়ে দাও। চালাকি চলবে না! দু-চার টাকা নয়, মোটা টাকা খরচ করে'!

নানা দিক থেকে নানা অভিমত:—চাঙোয়া···ইম্পীরিয়াল ···কাশানোভা···হিন্দু ভোজনালয়···খানখানা হোটেল···

মহিম যেন বন্দী!··কোনোমতে বল্‌লে,—খাওয়াবো··· নিশ্চয় খাওয়াবো। তবে আজ নয় ভাই, মাপ করো। বিকেলের ট্রেণে আমার বাড়ী যাবার কথা। বাবা মা সেখানে অত্যন্ত অধীর হয়ে আছেন। বাড়ী থেকে ফিরবো পরশু···ফিরে যত-শীঘ্র পারি, যেদিন তোমাদের সুবিধা বলবে।

কথাটা বলে' ত্বরিত পদে মহিম চললো এগিয়ে অফিসের বাহিরে খোলা প্রাঙ্গণের দিকে।

তবু কি মুক্তি মেলে! পিছনে কজনে ধাওয়া করে' এলো·

—পালালে চলবে না চাঁদ!

সুর্-লয়ে কেউ বললে—ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাত্তি!

মহিম বললে—পালাইনি···আজকের মত ক্ষমা চাইছি। দেশে যাচ্ছি···বেলা চারটেয় আমার ট্রেণ।

সকলের মুগ্ধ ঈর্ষালুব্ধ দৃষ্টি ঠেলে মহিম চলে গেল। ওদিকে কজন ছাত্রের মিনতি নিবেদন চলেছে বড় বাবুকে ধরে—আপনি চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে, স্যর···প্রিন্সিপালকে আপনি যা বলবেন···কুড়িটা নম্বর শুধু, স্যর। শ্বশুর বলছিল, নেক্‌সট্ ইয়ারে বিলেত পাঠাবে। ফেল হলে তা আর হবে না। তার মানে, কম্পাউণ্ডারী করে জীবন কাটানো! নিশ্বাস ফেলে ভাবুক গদাই বলে উঠলো—বঙ্কিম বাবু লিখে গেছেন না? ভারী ঠিক কথা চন্দর···ওদিকে ছাখো মহিমকে···যার মানে হলো, প্রতিষ্ঠা—আর এদিকে হরেনের দিকে চাও···বিসর্জ্জন!

২

মহিমের বাড়ী রাধানাথপুরে। কলকাতা থেকে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে। সেদিন শনিবার। বাজারে কিছু কেনাকাটা বাকী। কখানা বই···কিছু ফলমূল,··মায়ের জন্য একখানা ভালো শাড়ী···বাপের ওয়াচ দিয়েছিল কোন্ দোকানে অয়েল করাতে, সেটা আনা, তারপর মেশে··কিছু জলটল খেয়ে মেশ থেকে বেরিয়ে একখানা রিক্‌শ নিয়ে মহিম এলো শেয়ালদা ষ্টেশনে!

গরীবের ছেলে। বাপ বনমালী রায় গ্রামের স্কুলে টীচারী করেন। সংসারে বাপ মা আর মহিম। ছেলে ভালো, স্কলারশিপ নিয়ে ইউনিভারসিটির দুটো পরীক্ষা পাশ করে' মেডিকেল কলেজে ঢুকেছে। কোনো সঙ্গতি ছিল না। বাপের সাধ, ছেলে ডাক্তারী পাশ করে দেশের একজন গণ্যমান্য ডাক্তার হবে···স্যর নীলরতন কি মহেন্দ্র সরকারের মতন। বললেন—মেডিকেল কলেজেই ঢোকো বাবা, তোমার ছেলেবেলা থেকে সাধ! পয়সা-কড়ির ব্যবস্থা করবেন ভগবান···তাঁর

দয়া না থাকলে তোমার এতখানি এগুলো কি করে হলো? আমার কি-বা সামর্থ্য!...

শনিবারের ট্রেণ...ভিড়ে গম্‌গম্‌ করছে। ডেলি-প্যাশেঞ্জাররা আছেন, তার উপর চাকরির দায়ে যাঁরা কলকাতায় কোনমতে নাকমুখ গুঁজে পড়ে থাকেন, শনিবারে বাড়ী না গেলে নয়, বাড়ীতে প্রাণের স্বজনদের বাস, যাদের জন্য যাদের মুখ চেয়েই কলকাতায় কটা দিন সব কষ্ট সব অসুবিধা অগ্রাহ্য করে পড়ে' থাকা। কাজেই শনিবার বিকেল থেকে ট্রেণের কামরাগুলোয় মানুষ নয়, যেন গুড়ের নাগরি বোঝাই হয়! সবচেয়ে দুর্ভোগ থার্ড-ক্লাশ যাত্রীর—যে-ক্লাশ থেকে রেল-কোম্পানি মোটা টাকা রোজগার করে, তাদের বেলায় তেমনি মোটা রকমের ঔদাসীন্য! কোম্পানি ভাবে, ধুতি-চাদর-পরা যাত্রী, সামান্য চাকরি-বাকরি কিম্বা তুচ্ছ ব্যবসা-বাণিজ্য করে' খায়,—তারা চাকরিই রাখবে, অসুবিধা হলে পাঁচজনে মিলিয়ে চোখ রাঙাবে,—তেমন অবসর তাদের নেই। কাজেই মালের মতো তাদের কোনমতে আনা-নেওয়া করছে, এই ঢের!

মহিমের থার্ড-ক্লাশ টিকিট। ট্রেণের কামরায় দুপয়সা বেশী দাম দিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য-সুখ ভোগ করলেই আপার ক্লাশ বলে' গণ্য হবে, নচেৎ মান-সম্ভ্রম রসাতলে গড়িয়ে পড়বে, এ-ধারণা তার মনের কোণেও ঘেঁষতে পারে না।

থার্ড ক্লাশ কামরাগুলোর মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখে, আগাপাস্তলা ভরা-ভরতি! ওর মধ্যে একটায় একটু ফাঁক দেখে মহিম গিয়ে আসন অধিকার করে' বসলো...দুটি বিচিত্র যাত্রীর মধ্যে। একপাশে বিপুল মোটা এক ভদ্রলোক, তিনি কখন ট্রেণের কামরায় উঠেছেন, জানে না,—তবে বসেই তিনি যে নিদ্রা-সুখ উপভোগ করছেন,—সে সুখ তাঁর নাসা দিয়ে বিপুল নির্ঘোষে প্রচারিত হচ্ছে! আর-একপাশে

অনির্বাণ

যাকে বলে লেংথ উইদাউট ব্রেডথ, জীর্ণকায় তরুণ বয়সী ভদ্রলোক! তিনি সজাগ আছেন—তবে লগেজপত্র পায়ের সামনে ডাঁই হয়ে আশেপাশে বহু যাত্রীর বসায় অসুবিধা ঘটিয়েছে। পায়ের নীচে জড়ো-করা লগেজ ছাড়া জীর্ণ ভদ্রলোকের দু'হাত জোড়া···এক হাতে পাৎলা গামছায় বাঁধা বউবাজারের ছানা, আর এক হাতে ভাঁড়ে কোন্ ঠাকুরের চরণামৃত! ছানা এবং চরণামৃত—দুটি বস্তুকে সাবধানে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে নিয়ে যেতে হবে—ভদ্রলোক তাই হাত দুটিকে প্রসারিত করে' রেখেছেন! কোনমতে এ দুই ভদ্রলোকের হাঁটু দুটি নেড়ে তাঁদের মধ্যে মহিম নিজেকে বসিয়েছে! বসেই সে তার থলির-ব্যাগ খুলে বার করলো সদ্য-কেনা আনন্দমঠ উপন্যাস। বাহিরে প্রচণ্ড ভিড়, প্রচণ্ডতর কোলাহল এবং কামরার মধ্যে আরো প্রচণ্ড তাপ। সকল তাপ ভুলে আনন্দমঠে মনঃ-সংযোগ করলো একাগ্রভাবে। শনিবারের লোকাল ট্রেণে থার্ড-ক্লাশ কামরা···পৌরাণিক যুগের লোক এসে শেয়ালদা ষ্টেশনে এ-কামরা দেখলে অবাক হবেন! কি-আর্ক বা নোয়া বানিয়েছিলেন সেই প্রলয়ের দিনে দুনিয়ার সর্বশ্রেণীর জীব-জন্তু বইতে···এখানকার থার্ড-ক্লাশে প্রবেশ করলে নোয়ারও আজ মাথা ঘুরে যেতো।

কিন্তু সে-কথা থাক! কামরায় বসে পড়ায় মন দেওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার যেন! পাশাপাশি কামরার পর কামরা···ব্যবধান শুধু এক হাতটাক করে' কাঠের পার্টিশন। সে-পার্টিশনের এ-দিককার যাত্রীর আর ও-দিককার যাত্রীর পিঠে-পিঠে বার-বার হচ্ছে ঠোকাঠুকি এবং তা নিয়ে তর্কবিতর্ক উঠছে অবিরাম···ওদিকে যাঁরা ভাগ্যবান, খোলা জানলার ধারে স্থান সংগ্রহ করেছেন তাঁরা। কামরার সব আরামটুকু তাঁরাই ভোগ করেছেন! তাঁদের মধ্যে কেউ চোখ বুজে নিদ্রার গহনে প্রবেশ করে প্রাণরক্ষা করছেন, যাঁদের চোখে নিদ্রা নেই তাঁদের

সবার কণ্ঠে বিবিধ রকমের সঙ্গীত উঠছে ঝঙ্কৃত হয়ে। সঙ্গীতের সে-বৈচিত্র্যে প্রখর-তপন-তাপ-ক্লিষ্ট অন্য যাত্রীদের কষ্ট আরো অসহ্য হয়ে উঠছে...

মোটা আর রোগার মাঝখানে বসে মহিমের অস্বস্তির আর সীমা ছিল না।...বইয়ের পাতায় তন্ময়, হঠাৎ মোটা সঙ্গী ঘুমের ঘোরে কাৎ হয়ে ঢুলে পড়লো মহিমের গায়ে...ঘর্ম্মাক্ত কলেবর। সন্তর্পণে তাকে ঠেলা দিতে মোটার ঘুম গেল ভেঙ্গে। ঘুম ভেঙ্গে মোটা বলে উঠলো,—ঘুমোতে দেবেন না! আশ্চর্য্য মানুষ!

সবিনয়ে মহিম বললে—ঘুমোতে মানা করিনি, তবে গায়ে ঢুলে পড়ছেন কি না।

মুখ বাঁকা করে মোটা বললে—মানুষের ঘেঁষ সইতে না পারেন, বেশী পয়সা দিয়ে ফাষ্টো কেলাসে যান।

মহিম দেখলে সর্ব্বনাশ!—ভদ্রলোক অপরাধ করবেন, আবার চোখ রাঙাবেন!

মহিম বললে—মাপ করবেন মশায়, আমারি অন্যায় হয়েছে।

সঝঙ্কারে মোটা বললে—অন্যায় হয়েছে নিশ্চয়...একশোবার অন্যায়, দুশোবার...

ঝাঁকানি দিয়ে মোটা আবার করলো নিদ্রার উদ্যোগ। ওদিকে ও-পাশের রোগা গান শুনতে শুনতে বোধ হয় কেমন মুগ্ধ হয়েছিল, এত মুগ্ধ যে তাল-বেতালের বাধা অগ্রাহ্য করে' পা নেড়ে হাঁটু ঠুকে তাল দিতে লাগলো। তালের ঝোঁকে ছানার জল চলকে পড়লো মহিমের গায়ে...

দু'চোখে প্রতিবাদ ভরে' মহিম বললে—মশায়...

—ওঃ! রোগার মুখে আর কোনো কথা নিঃসারিত হলো না...

বেঞ্চের গায়কের উদ্দেশে রোগা বললে,—তালে একটু গোল হচ্ছে মশাই···ওটা হবে ধাঁ কেটে ধাঁ কেটে ধাঁ···

ট্রেণ চলেছে···থার্ড-ক্লাশ কামরায় কি ঘটছে, তার কোনো সংবাদ না নিয়েই!

ষ্টেশনের পর-ষ্টেশন···যাত্রীদের ওঠা-নামা···খাবার-ওয়ালাদের ছুটোছুটি চীৎকার···ধারালো কাটারি নিয়ে ডাবওয়ালাদের চীৎকার ···মহিম মাঝে মাঝে চোখ তুলে চেয়ে দেখে, মনে মনে হাসে। ভাবে, মানুষ যত শিক্ষাই লাভ করুক, ট্রেণে যাবার সময় তার মন থেকে আদিম দুর্বৃত্তটি বাধা ঠেলে ঠিক বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়। ট্রেণে যেতেও যে আচারে-ব্যবহারে ভদ্র হতে হয়, অপরের সুখ-সুবিধা দেখতে হয়···নিজেকে অতিশয় স্বার্থপর করে তোলা অনুচিত, এ-সব কথা মানুষ কি করে' ভুলে যায়!··

এমনি চীৎকার কোলাহল এবং বিপর্য্যয় বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে ষ্টেশন এলো রাধানগর। সাবধানে সকলের ঘেঁষ বাঁচিয়ে মহিম ট্রেণ থেকে নামলো।

গেটের মুখে দেখা চির-পরিচিত প্রৌঢ় টিকিট-কলেক্টর রাখাল বাবুর সঙ্গে।

স্মিতহাস্যে রাখালবাবু বললেন – বাড়ী এলে!

মহিম জবাব দিলে—হ্যাঁ।

—পাশের খবর বেরুলো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, পাশ করেছি।

—বা, বা, বেশ, বেশ···

টিকিট দিয়ে মহিম এলো পথে।

পথে দু'চারখানা ভাড়াটে গাড়ী। ঘোড়াদের শীর্ণ বিশুষ্ক মূর্ত্তি ···দেখলে তাদের-টানা গাড়ীতে চড়তে মমতা হয়। গাড়ী ভাড়া

করে সে-গাড়ীতে বসে বাড়ী যাওয়া, মহিমের কাছে বিলাসিতা! তাছাড়া কত-টুকুন্ বা পথ! রোদ পড়ে এসেছে···ট্রেণের তাড়া নেই, আধ-ঘণ্টা মাত্র··

মহিম হেঁটে চললো বাড়ীর দিকে।···

পথের দুধারে রেল-কোয়ার্টার্স···ইটের তৈরী একতলা কতকগুলো খোপ্, টালির চালু ছাদ···সদর রাস্তার গায়ে মস্ত নালা।··· নালার উপরে ছ্যাঁচা-বাঁশের পুল। এই পুল পার হয়ে মাঠ, মাঠের বুক চিরে পায়ে-চলা পথ···সে-পথে কোয়ার্টার্সে যেতে হয়। ওদিক দিয়ে নালা-নর্দ্দামা ডিঙ্গিয়ে বন-ঝোপ ঠেলে ওঠা যায় ষ্টেশনে প্ল্যাট-ফর্ম্মের প্রান্তে। মাষ্টার-মশায়রা ঐটিকেই ব্যবহার করেন শর্ট কাট বলে'। কামরাগুলোর পিছনে এঁদো পুকুর···পুকুরের বারো-আনা ভাগ ঘন-শ্যাওলায় ভরা···বাকী সিকি-অংশ দেখা যায়···কালিগোলা নোংরা জল···কটা হাঁস ঘুরে বেড়াচ্ছে পুকুরের ধারে পচা-পাঁকে কিসের সন্ধানে।

এ-পথ সোজা গিয়ে আর একটা পথে মিশেছে। দু-নম্বরের পথ ঘুরে চলে গেছে গ্রামের মধ্যে। এ পথের ধারে ধারে দূরে দূরে মানুষের বসতি, আমের বাগান, পচা ডোবা, পুকুর, বাঁশ-বন। গরীব ক'জন কামার-কুমোরের চালা-ঘর, সিধু ময়রার খাবারের দোকান···পুঁটি ধোপানীর ভাঁটী···তারপর হাট, বড় অশথ গাছের নীচে শান-বাঁধানো রোয়াক··রোয়াকের উপর সিঁদূর লেপা একটি বিগ্রহ···সিঁদূরের প্রলেপে বিগ্রহের স্বরূপ বোঝা যায় না,—পুরুষ, কি নারী, তারো হদিশ মেলে না! এ-জায়গাটুকু ষষ্ঠীতলা বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে' আসছে ···কোন সে নবাবী আমল থেকে! সাহিত্য পরিষদ কোনোদিন চেষ্টা করেন যদি, তবেই বিগ্রহের ইতিবৃত্ত জানা যাবে।

এই পথ ধরে মহিম চলেছে···চৈত্র-মাসের দিন-শেষ···বাতাসে

যেন তুফান বইছে…স্নিগ্ধ শীতল স্পর্শ। সব ক্লান্তি দূরে যায় এ বাতাসের স্পর্শে। কটা আম গাছ—বৌউলের প্রাচুর্য্যে যে গন্ধ, সে গন্ধে মন মুগ্ধ হয়ে ওঠে!

আধ-ঘণ্টা চলার পর একটা বাঁক…বাঁকের মুখে ডাক-ঘর…ডাকঘরের পাশে বিষ্টু মুদির দোকান…দোকানের সামনে বটতলা…তকতকে ঝকঝকে করে' নিকোনো…এখানে মাদুর পড়েছে, আর মাদুরে বসে বিষ্টু সদলে গ্রাবু খেলছে।

মহিমকে দেখে বিষ্টু বললে,—বাড়ী আসছো দাদা?

মহিম বললে—হ্যাঁ বিষ্টুদা…

বিষ্ণু বললে—কলকাতার খপর কি? খুব গরম?

মহিম বললে—নিশ্চয়। পিচঢালা রাস্তা…গাড়ীঘোড়া গড়গড়িয়ে যায় কিন্তু আঁচে গরীবের পায়ে ফোস্কা পড়ে।

বিষ্ণু বললে—পাশের আর কত দেরী গো দাদা?

—এখনো দু'বছর বাকী বিষ্ণুদা…

—নাও দাদা চট্‌পট্ পাশ সেরে…তারপর গাঁয়ে এসে বসো। কি পশার তোমার করে'দি, দেখো তখন।

মাথা নেড়ে খুশী-মনে মহিম চললো। পিছনে…শুনলো উচ্ছ্বসিত স্বর—ইস্তক কাবার!

মহিম হাসলো মনে-মনে…ভাবলো, সরল সহজ মানুষ সব…কি অল্পে তুষ্ট হয়! কত অল্পে অভাব-অভিযোগ ভুলে যায়।…আর সহরে? …মানুষের আকাঙ্ক্ষা সেখানে সীমা ছাপিয়ে চলে! যত পায়, চাওয়ার মাত্রা আরো তত বাড়ে!

আর একটুখানি পথ…ঐ দেখা যায়…চাঁনদির বাড়ীর শ্যামসুন্দরের মন্দিরের মাথায় জীর্ণ মলিন চূড়ো। তার আগে মুন্সীদের বাড়ীর ঝাঁকড়া কনক-চাঁপার গাছ…এখানে পর্য্যন্ত কনক চাঁপার গন্ধ ভেসে

আসছে। তলিদের পুকুর···তারপর ঋষি ঘোষালের বাড়ী···গোয়াল··· তার উল্টো-দিকে···কবে সেই ধ্বংশে ঝরে পড়া হালদারদের বিরাট বাড়ী···হালদাররা আজ ত্রিশ বছর সহর-বাসী···গ্রামের সঙ্গে সব সম্পর্ক মুছে দেছে। অনাদরে অবহেলায় প্রকাণ্ড তুমহল বাড়ী ফেটে ভেঙ্গে নিজেকে মাটির গায়ে মিশিয়ে দেছে। বাগান হয়েছে জঙ্গল···কাক-চক্ষু হালদার্ণী পুকুর শুকিয়ে মজে পড়ে আছে। হালদারদের পোড়ো জমির দিক থেকে আসছিল শিবানী···ঋষি ঘোষালের ভাইঝী··· ঘোষালের মুংলী গরুকে প্রত্যহ সকালে খুঁটীতে বেঁধে রেখে আসে ঐ পোড়ো বাগানে, সন্ধ্যার সময় গিয়ে গরু নিয়ে আসে, এনে গোয়ালে বাঁধে।

শিবানী দেখতে পেয়েছিল মহিমকে···দেখে পা চালিয়ে সে আসছিল···মহিমের দৃষ্টি ছিল কিন্তু বিপরীত দিকে···ঋষির বাড়ীর পানে।

শিবানী ডাকলো—মহিমদা···

মহিম চমকে উঠলো! স্বর লক্ষ্য করে চেয়ে দেখে, ডান দিকে একটা সজনে গাছের পাশে শিবানী···মুংলীর দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে!

মহিম বললে,—এনেছি তোমার বই···শিবানী। গীতাঞ্জলি আর ভারতবর্ষের ইতিহাস।

শিবানীর দুচোখে খুশীর দীপ্তি ফুটলো। শিবানী বললে,—রাখো। এখন নয়। ঠানদির ওখানে যাবে তো ঠাকুরের আরতির সময়··· সেইখানে আমি থাকবো··· সেইখানে নিয়ে যেয়ো বই।

মহিম বললে—বেশ। কিন্তু আর কিছু খপর জানবার নেই তোমার?

—কি খপর মহিমদা?

মহিম জবাব দিচ্ছিল···দেওয়া হলোনা। বিপরীত দিকে ঋষি

ঘোষালের বাড়ী থেকে যেন অট্টরবে কাঁসর বেজে উঠলো···শিবানীর খুড়ীর কণ্ঠে। খুড়ী চেঁচাচ্ছে—শিবি· শিবি···ও শিবি···ও পোড়ার মুখী ও হতচ্ছাড়ী···বলি, বেঁচে আছিস? না, যমের বাড়ী গেছিস?

দুজনে চকিতে যেন কাঠ: ভ্রূভঙ্গী করে' শিবানী বললে—ডাক পড়েছে মহিমদা···

রুদ্ধ নিশ্বাসে মহিম বললে—হুঁ। শাস্ত্রে বলে গুরুজনকে ভক্তি করতে হয়। কিন্তু এমনি গুরুজন···

—কি যে বলো মহিমদা! আমি তাহলে পালাই। এসো কিন্তু ঠানদির ওখানে।

খুড়ীর কণ্ঠ অবিরাম চলেছে···যেন গ্রামোফোনে কে রেকর্ড চাপিয়ে দেছে· রেকর্ড বাজছে—ঘরের কর্ণা রইলো সব পড়ে···ধিঙ্গি মেয়ে সিঙ্গী সেজে পাড়া মাতিয়ে বেড়াচ্ছেন! ওলো ও শিবি, ও হতচ্ছাড়ী, ও হাড়হাবাতী···

চোখের কোণে করুণ দৃষ্টি···শিবানী ছুটলো মুংলীকে নিয়ে। পথে মহিম চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো ক্ষণকাল···তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে শিবানীদের বাড়ীর পানে চাইতে চাইতে চলে গেল।

মুংলীকে কোনমতে খুঁটিতে বেঁধে শিবানী গিয়ে দাঁড়ালো খুড়ীর সামনে···যেন চুরি করে ধরা পড়েছে, এমনি কুণ্ঠিত ভাব! খুড়ীর সেদিকে লক্ষ্য নেই···তখনো মনের মধ্যে জড়ো-করা বুলি ঝর্ণা বয়ে চলেছে···

নম্র কণ্ঠে শিবানী বললে—ডাকছো খুড়িমা?

খুড়ী যেন আকাশ থেকে পড়লো!—তবু ভালো···কানে পৌচেছে বাঁদীর কথা! আমার চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি! বলি, কোন রাজপুরীতে গিয়েছিলে বাঁশী বাজাতে, শুনি?

ভীত কণ্ঠে শিবানী বললে—হালদারদের বাগান থেকে মুংলীকে আনতে গিয়েছিলুম।

খুড়ী খুশী হলো না জবাবে। বললে—তবেই আর কি, আমার জন্ত স্বর্গে বাতি দিয়ে এসেছো! ছুতো মুখে লেগে আছে সব সময়, নয়? ...তা যাক মরুকগে, আমার দোক্তার কৌটোটা কোন লোহার সিন্দুকে চাবি-বন্ধ করে রেখে গেছ যে সারা বাড়ী খুঁজে কৌটো পাচ্ছি নে!

শিবানী জবাব দিলে—তোমার কৌটো তো মতির মাকে দিয়েছো খুড়িমা। মতির মা বললে নতুন দোক্তা তৈরী করেছে...তুমি তাই কৌটো দিলে—বললে, তোমার কৌটো যেন ভরে আনে সন্ধ্যার সময়।

খুড়ী তবু ছাড়তে চায় না! বললে—তা বেশ তো, নিজে সে কৌটো বয়ে না আনতে পারবে যদি তো কোন্ মনে করিয়ে দিয়েছিলে বেরুবার সময়, আমিই না হয় এই বেতো কোমর নেড়ে কোনরকমে গিয়ে মতির মার কাছ থেকে কৌটো নিয়ে আসতুম।

কুণ্ঠার ভারে শিবানী একেবারে এতটুকু হয়ে গেল। বললে—আনবো কৌটো?

উদাস ভাবে মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলে খুড়ী বললে—তোমার দয়া!

শিবানী তখন ফিরলো দোরের দিকে...মতির মার বাড়ী গিয়ে মতির মার কাছ থেকে দোক্তার কৌটো আনতে যাবে...

এমন সময় ঝড়ের মতো বাড়ীতে ঢুকলো খুড়ো ঋষি ঘোষাল... হাতে মস্ত একটা হুইল ছিপ আর ছেঁড়া-গামছার পুঁটলি।

ঢুকেই বীরের ভঙ্গীতে বললে—কোথায় যাচ্ছিস রে শিবু? দাঁড়া... মাছ যা ধরে এনেছি বদ্দিপাড়া থেকে...দেখলে তাক লেগে যাবে।

মাছের নামে খুড়ীর মনের ঔদাস্য চকিতে মিলিয়ে গেল! তবু অসম্ভব অনাগ্রহের ভাব দেখিয়ে খুড়ী বললে—মাছ কি হবে, শুনি আবার এবেলায়? ওবেলার মাছ রয়েছে এতগুলো···মাছ রাঁধতে তেল লাগে না···না?

ঋষি বললে—আরে, এ পয়সা দিয়ে কেনা মাছ নয়···ছিপে ধরা। এর জন্য খরচ হয়েছে একমুঠো কুঁড়ো···ব্যস! আর মাটী খুঁড়ে বার করেছিলুম কতকগুলো কেঁচো!

খুড়ী বললে—দেখি কি-মাছ।

মহা-উৎসাহে ঋষি বললে শিবানীকে—খোল্ তো মা পুঁটলি। এই এত ধরেছি গো।

শিবানী সাগ্রহে পুঁটলি খুললো। পুঁটলি খুলতে খুড়ী চেয়ে দেখে, গোটাকতক পুঁটি।

পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে উঠলো রাগে। বললে—সারাদিন বাইরে হৈ-হৈ করে নেচে সন্ধ্যার সময় নিয়ে এলেন কটা পুঁটি মাছ! ও মাছ কে খাবে শুনি? আমার ছেলেমেয়েরা ও-মাছ ছোঁয় না···বলে, পাঁকের গন্ধ!

ঋষি অপ্রতিভ হবার মানুষ নয়! বললে—কুছ পরোয়া নেই। আমি খাবো এ মাছ···আর খাবে শিবু। কি রে শিবু, তুই পুঁটি মাছ খাস তো? না, পাঁকের গন্ধ লাগে?

ম্লান মৃদু হাস্যে শিবানী বললে—খাই কাকা···

—অল রাইট। তোতে আমাতে খাবো। পুঁটিমাছের অম্বল, সে যা হয়, একেবারে ফাষ্ট ক্লাশ! নে মা মাছগুলো···নিয়ে রেখে আয়। অনেক মেহনত করে ধরা, বেরালের পেটে না যায়। আর অমনি আমার জন্য একটু কাঠ-কয়লার আগুন যদি দিস মা, সারাদিন

একছিলিম তামাক খেতে পাইনি···পেট ফুলে যেন জয়-ঢাক হয়ে আছে রে।

শিবানী গেল রান্না-ঘরের দিকে মাছের পুঁটলি হাতে; ঋষি বললে স্ত্রীর পানে চেয়ে···মিনতি-ভরে—একটু জল দাও গো, হাত দুখানা ধুয়ে একটু তামাকের চেষ্টা দেখি।

৩

পাড়ার ঘরে ঘরে শাঁখ বাজছে···সন্ধ্যার শাঁক। রোয়াকে বসে নিশ্চিন্ত মনে ঋষি করছে তামাক সেবা···শিবানী তুলসী-তলায় প্রদীপ দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে ঘরে গেছে···কাচা শাড়ী পরে এখনি যাবে ঠানদির বাড়ী। সেখানে আছেন ঠানদির শ্যামসুন্দর বিগ্রহ। সন্ধ্যায় আরতির সময় শিবানীকে নিত্য সেখানে হাজরে দিতে হয়···তার উপর ঠানদি ভার দেছেন অনেকখানি···পুষ্পপাত্র আর নৈবেদ্য সাজানো··· আরতির পর ঠাকুরকে মালা পরানো। খুড়ীর তাতে আপত্তি থাকলেও সে-আপত্তি প্রকাশ করতে সাহস হয়নি···তার কারণ ঠানদির কাছ থেকে এটা-সেটা নিত্য পায় উপহার।··ঠানদি একা মানুষ··· স্বামীর দেবোত্তর সম্পত্তির আয় যা আছে, তার দৌলতে অনেকে তাঁর কাছে কিছু-না-কিছু বিকিয়ে আছে। তাঁর কাছে কারো প্রত্যাশা নিষ্ফল হয়না। খুড়ীকে সম্প্রতি কোন্‌খান থেকে কোমরের বাতের জন্য ঠানদি মাদুলি আনিয়ে দেছেন পয়সা খরচ করে'···সে-পয়সা ঠানদি নেন্‌নি।

রোয়াকে দাঁড়িয়ে খুড়ী শোনাচ্ছিল খুড়োকে ঘর-সংসারের প্রয়োজনীয় কথা···খুড়ো নির্লিপ্ত নিরুপায় ভাবে সে কথা শুনছিল·

এবং পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে শিবানী···কথাগুলো তার কাণে বাজছে ···যেন বন্দুকের আওয়াজ !

খুড়ী বলছিল,—দুপুরবেলায় বাড়ী ছিলে না, নকুল চক্রবর্ত্তী এসে দু'দুবার ফিরে গেছে ! ফুলশয্যার পরের দিন থেকেই সংসারের ভার নিতে পারবে, তাই শিবুকে পেলে সে আর কোনো মেয়ে চায় না !···

মুখখানাকে বিকৃত করে ঋষি বললে—না, না, নকুল চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে বিয়ে দেবো কি ! বয়সের গাছপাথর নেই···চার-চারটেকে পার করেও বিয়ের সাধ মিটলো না ! কি বলো তুমি ! না, না, নকুল চক্রবর্ত্তীকে খুড়ো বলি। সবাই বলে, তাই। নাহলে আমার বাবার চেয়েও বয়সে দু-চার বছরের বড় হবে তো ছোট নয় !

খুড়ীর মাথায় জ্বললো আগুন। সংসারের নানা জ্বালায় এমনিই তো অহরহ জ্বলছে···যেন চিতোরের পদ্মিনী রাণীর জহর-ব্রত ! নকুলের প্রসঙ্গে মনে যাহোক্ একটুখানি ঠাণ্ডা বাতাস লাগে !···সেই মানুষের কথায় জ্বালা ভুলে মেজাজকে যথাসম্ভব স্নিগ্ধ শান্ত করে কথাটা পেড়েছিল,···সে কথায় ঋষির এমন তাচ্ছল্য ! খুড়ী একেবারে খেঁকিয়ে উঠলো—তোমার নকুল-খুড়ো বুড়ো হয়েছে, বটে ! আর তোমার ভাইঝীটি ক' মাসের খুকী, শুনি ? ও-বয়সে আমার কোলে পুঁটি হয়েছে, গোবরা হয়েছে···তোমার ভাইঝীর কপালে বর জোটেনি, তাই। মেঘে মেঘে বয়স ওঁর কম হয়নি ! বলে, সুবুদ্ধি দিলে তা কেন শুনবে ? পুরুষ মানুষ কি না ! তেজ থাকবে না যে !

নিঃশব্দে ঋষি এ-মন্তব্য পরিপাক করতে লাগলো···খুড়ী সমানে বকে চললো—হাভাতে বরাত, শুনবে কেন ? বরাতে নেই কো ঘী, ঠকঠকালে হবে কি ! বলে, মেয়েকে দেবে গা'ভরা গয়না···আমায় দেবে নমস্কারী বলে ষোল ভরি সোনার অনন্ত গড়িয়ে আর বিয়ের খরচপত্র

বলে তোমায় দেবে গুণে একটি হাজার নগদ!...এক হাজার টাকা একসঙ্গে চোখে দেখেছো কখনো?

এ-সব কথা ঋষির কাণে গেল কি না, কে জানে! নির্বিকার বসে সে তামাক টানছে। আকাশ ঘিরে ছায়ার পর্দা নামছে...দিনের আলোর শেষ রেখাটুকুকে ঢেকে দিয়ে। দু-চারটে পাখী ডাকছে... ডাহুক...কোকিল। খুব দূরে কে বাঁশী বাজাচ্ছে...বাঁশের বাঁশী... বাঁশীতে গেঁয়ো সুর...সে-সুরে ঋষির মনে সেই কবেকার একখানা ছবি অস্পষ্ট আভাসে দেখা দিচ্ছে! দাদা মথুরেশ কেষ্টনগরের কোর্টে চাকরি করতো...দু'পয়সা রোজগার ছিল। বৌদি পরলোকগতা— মেয়ে শিবানীর বয়স তখন দশ বছর মাত্র...রাধানগরে যে জমিজমা আছে পৈত্রিক, তা থেকে কিছু আদায় হতো, দাদা তার পাই-পয়সা গ্রহণ করতো না। বলতো—না, ও সব তুই খরচ করিস...তোর সংসার বড়, আমি যা রোজগার করি, তাতে আমার স্বচ্ছন্দে চলে যায় ...একটা মাত্র মেয়ে তো! শিবানীর লেখাপড়ার দিকে দাদার কি ঝোঁক না ছিল! দাদা বলতো, সময় যে-রকম পড়েছে, মেয়েদের এখন আর অ-আ শিখিয়ে রাখলে চলবে না...ছেলেদের মতই তাদের লেখাপড়া শেখা দরকার। সেই দাদার হঠাৎ হলো দুরন্ত ব্যাধি। সেখান থেকে লোক এলো খপর নিয়ে—এখনি চলুন...গতিক ভালো নয়! খপর শুনে ঋষি তখনি ছুটলো দাদার কাছে। যাবার পর দাদা বেঁচে ছিল ছটি ঘণ্টা...সেই ছ'ঘণ্টা মেয়ের জন্য দুশ্চিন্তায় কেটেছিল। তারপর কাজ সেরে পরের দিন শিবানীকে নিয়ে ঋষি ফিরলো রাধানগরে। বৌদির গহনা—দাদার সঞ্চয়—ব্যাঙ্কের পাশ-বই —দু-হাজার টাকার লাইফ-ইনসিওরের পলিশি...খাট-আলমারি, টেবিল-চেয়ার...দাদা তো শিবানীকে শুধু হাতে ঋষির ঘাড়ে চাপিয়ে যায়নি। শিবানীর বিয়ের জন্য দু-হাজার টাকার এনডাউমেণ্টও

ছিল···লক্ষ্মীছাড়া ঋষি শিবানীর সর্ব্বস্ব পেটে পুরে বসে আছে।··· বৌদির গহনাগুলি শুদ্ধু এই স্ত্রীর পাল্লায়! স্ত্রী কি দেবে? ভয় হয় সে কথা মনে করিয়ে দিতে!···একবার আভাস দিয়েছিল···তাতে যে-চোখে স্ত্রী তার পানে চেয়েছিল···

একটা নিশ্বাস ঋষি চাপতে পারলো না।

কিন্তু সে-নিশ্বাসে খুড়ীর মনের ভিতরকার ধূমায়মান বহ্নি যেন বাতাস পেয়ে জ্বলে উঠলো! খুড়ী বললে—থাক, আর যদি তোমার আদরের ভাইঝীর বিয়ের কথা বলি তো···

খুড়ী একটা কদর্য্য এবং অকথ্য শপথ গ্রহণ করলো। সে শপথ থেকে তার পরলোকগত পিতা-মাতা ও মুক্তি পেলেন না!

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে শিবানী এ-কথা শুনলো। বুঝলো, খুড়ী এবারে যে মূর্ত্তি ধরবে, খুড়োর দুর্গতি তাতে বাড়বে। খুড়োর সে-দুর্গতি নিরুপায়ে সহ্য করা কঠিন হবে ভেবে নিঃসাড়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

ঋষির নজর পড়লো··ঋষি বললে—কোথাও যাচ্ছিস নাকি মা?

শিবানী বললে—হ্যাঁ কাকা, ঠানদির ওখানে যাচ্ছি···আরতির সময় রোজ যাই তো!

—যা, যা মা···ঘুরে আয়। তারপর মনে আছে তো, ঐ যে পুঁটি মাছ এনেছি, তার অম্বল। আমি বলে দেবো'খন কেমন করে রাঁধতে হয়···আর তুই রাঁধবি। কেমন?

মলিন মৃদু হাস্যে শিবানী বললে—আরতি হলেই আমি ফিরে আসবো।

শিবানী আর দাঁড়ালো না, বেরিয়ে গেল। তার পানে চেয়ে খুড়ী ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললে—ঢং দেখে দেখে চোখ পচে গেল। আমার মরণও হয় না, ছাই!

তুলসী-তলায় প্রদীপ দিয়ে মা সন্ধ্যার শাঁক বাজাচ্ছেন, মহিম বেরুলো ঘর থেকে···হাতে বইয়ের প্যাকেট।

মা বললেন—হ্যাঁরে এই তো এলি! মুখ-হাত ধুয়ে জল খেলি, একটু না হয় জিরো···তা নয়, আবার বেরুচ্ছিস!

মহিম বললে—একবার ঠানদির ওখানে যাচ্ছি মা···পাশের খপরটা দেবো, অমনি শ্যামসুন্দরকে প্রণাম। তাছাড়া ঠানদি একখানা বই আনতে বলেছিল···বঙ্কিম বাবুর আনন্দ-মঠ···সেই সঙ্গে শিবানীর দুখানা বই গীতাঞ্জলি আর ভারতবর্ষের ইতিহাস···দিয়ে আসবো।

মা বললেন—শিবানীকে বই দিচ্ছিস! ওর খুড়ী জানলে কিন্তু রক্ষা রাখবে না। মেয়েটাকে তো বাঁদীর হাল্ করে রেখেছে···একটু লেখাপড়া করবে, তাও খুড়ীর দু'চোখের বিষ!

মহিম বললে—খুড়ী জানবে না। শিবানী তো ঠানদির ওখানেই এখন পড়াশুনা করে।

মা বললেন—দেখিস বাবা, বইয়ের জন্য মেয়েটাকে না আবার খোয়ার সইতে হয়। এত কষ্ট হয় মেয়েটার জন্য!

মা নিশ্বাস ফেললেন···মহিম দু-পা অগ্রসর হলো দোরের দিকে।

মা বললেন—কিন্তু শীগগির ফিরিস মহিম···আমার মনটা সারা দিন যে কী হয়ে আছে! উনি সেই কোন্ ভোরে দুটি ভাত মুখে দিয়ে বেরিয়ে গেছেন, এখনো দেখা নেই!

মহিম থমকে দাঁড়ালো, বললে—বাবা এখনো স্কুল থেকে ফেরেননি? স্কুলে মিটিং আছে না কি?

মা বললেন,—স্কুলে তো উনি যাননি আজ। গেছেন সদর কাছারিতে।

—বাবা সদর-কাছারিতে !

মা বললেন—হ্যাঁ, কি-না-কি খুব দরকারী কাজ আছে সেখানে! বললেন, না গেলে নয়।

সদর-কাছারিতে বাবার কাজ? মহিমের কণ্ঠে বিস্ময়। মহিম প্রশ্ন করলো—কি কাজ মা?

—আমাকে কি কোনো কথা বলেন তিনি যে জানবো?···কদিন দেখছি, মনটা কেমন যেন তার···কি যেন ভাবছেন! জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে গা? তার জবাব দিলেন না। মুখের দিকে কেমন এক-রকম ভাবে চেয়ে রইলেন। তারপর মস্ত নিশ্বাস ফেললেন।

উদ্বেগে মহিমের বুক দুলে উঠলো। মহিম বললে—তাইতো, কি হলো আবার?

মা বললেন—উনি এলে জিজ্ঞাস করিস, তোকে যদি বলেন!

মহিম বললে—নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করবো···

মা বললেন—তাহলে বেরুচ্ছিস···আচ্ছা, একটু ঘুরে আয়।

মহিম বললে—হ্যাঁ মা···ঘুরে আমি এখনি আসছি।

মহিম বেরিয়ে গেল। ছেলের পানে চেয়ে মা বললেন—দুর্গা দুর্গা দুর্গা···

বাড়ীতে বাড়ীতে শঙ্খরোল···সন্ধ্যাকে সকলে সমাদরে বরণ করছে···শান্তির প্রত্যাশায়···দিনের শ্রান্তি মুছতে সকলে ঘরে ফিরছে···

মহিম এলো ঠানদির বাড়ী।

পাড়ায় থাকেন। প্রৌঢ়া বিধবা। ছেলে নেই, মেয়ে নেই। নিকট আত্মীয় কেউ নেই···তবু গ্রামের সকলকে স্নেহের বন্ধনে বেঁধে আপন করে' নিয়েছেন। দেবত্র সম্পত্তি···ঠাকুর আছেন···শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ। এই ঠাকুরটি ঠানদির স্বামী পুত্র সংসার···সব! জমি-জমা

আছে, পুকুর আছে। আয় যা হয়, ঠাকুরের সেবায় সঁপে তা থেকেই ঠানদির চলে। অন্নবস্ত্রের দায় নেই। দেশের গরীব দুঃখী অনাথদের দিয়ে-থুয়ে ঠানদি পরম সুখে দিনাতিপাত করছেন!

শিবানীকে ঠানদি ভালোবাসেন। শিবানীর বাবা মথুর ছিল ঠানদির স্বামীর প্রায় সমবয়সী বন্ধু। ছেলে-মেয়ে নেই, স্বামীর কথায় স্বামীর বিষয়-সম্পত্তির সম্বন্ধে দেবোত্তরের ব্যবস্থা করিয়ে দেছে মথুরেশ। শ্যামসুন্দরের বিগ্রহটি মথুরেশই কেষ্টনগরের কারিগর দিয়ে তৈরী করিয়ে দিয়ে গেছে। শিবানী সেই মথুরেশের মেয়ে। বাপ-মা-মরা মেয়ে। শ্যামসুন্দরের সঙ্গে শিবানীকে ঠানদি তাই অভেদ বলেই গ্রহণ করেছেন। শিবানীর সম্বন্ধে খুড়ীর বিধি-নিষেধ ঠানদির বেলায় একেবারে অচল। ঠানদি নিজেই খুড়ীকে সে সম্বন্ধে বহুবার সচেতন করে দেছেন—তোমার ভাসুরঝী হলেও শ্যামসুন্দরের সেবায় শিবানীকে আমার চাই।

এবং সে-নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করার মতো শক্তি বা সাহস খুড়ীর কোনো দিন হয়নি। তবু প্রকাশ্যে কিছু না বললেও মনে মনে এজন্য শিবানীর উপর আক্রোশ ঘনায়িত ছিল।

ঠাকুরের আরতি শেষ হয়ে গেছে। শিবানী করছে ঠাকুরের সজ্জারাগ আর শয্যা রচনা। ঠাকুরের গলায় ঝুলিয়ে দেছে জুঁয়ের প্রকাণ্ড গোড়ে মালা…গন্ধ-দীপ জ্বেলে দেছে, শয্যায় ফুলের পাপড়ি ছড়ানো। উঠানে পাড়ার যত গরীব-দুঃখী এসেছে, ঠানদি করছেন তাদের প্রসাদ বিতরণ…সেই সঙ্গে সাগ্রহে সকলের কুশল-প্রশ্নাদি চলেছে। প্রসাদ নিয়ে তারা খুশী-মনে বাড়ী যাচ্ছে, এমন সময় মহিম এসে দাঁড়ালো প্রাঙ্গণে।

মহিমকে দেখে ঠানদির দু'চোখ খুশীতে প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো…

সহাস্তে খুড়ী বললেন—এই যে আমার গোঁসাই···এসো, এসো···

মহিম এলো সামনে।

ঠানদি বললেন—আজ সারাদিন গোঁসাইয়ের কথাই আমার মনে জাগছে। তারপর আরতির সময় দেখি, শ্রীমতীর চোখ ছুটিতে আনন্দের আভা! দেখে বুঝলুম, পায়ের নূপুরে গোঁসাই তাঁর পৌঁছুনোর খপর পাঠিয়ে দেছে শ্রীমতীর মনে।

হেসে মহিম বললে—ঠানদির শুধু হেঁয়ালি নয় তো··· হেঁয়ালিতে আবার রস ঝরে!··· তা যাক, বলতে এলুম, আমি পাশ করেছি ঠানদি, ভালো পাশ···স্কলারশিপ পাবো।

ঠানদি বললেন—বেশ, বেশ দাদা, তুমি পাশ করবে, এ আমি জানি। আর দু'বছর রইলো না পাশ করে ডাক্তার হয়ে বেরুতে?

মহিম বসলো রোয়াকে, বললে—হ্যাঁ, যদি তোমার শ্যামসুন্দরের কৃপা থাকে!

ঠানদি বললেন—যারা সত্যিকারের কাজ করে, ফাঁকি দেয় না, আমার শ্যামসুন্দর কখনো তাদের অকৃপা করেন না দাদা। এখন প্রসাদ খাও আগে, তারপর শুনবো সব কথা।

এ কথা বলে ঠানদি চাইলেন শিবানীর পানে। শিবানী গুণ-গুণ করে স্তব পড়তে পড়তে ঠাকুরের মশারি খাটিয়ে দিচ্ছিল···

ঠানদি ডাকলেন—বলি অ শিবানী···একবার চেয়ে দ্যাখো এদিকে ···প্রসন্ন হও, গোঁসাইকে প্রসাদ দাও।

সারা দেহে আনন্দের প্রবাহ, শিবানী সলজ্জ ভঙ্গীতে এলো বাইরে···হাতে ঠাকুরের প্রসাদ।

ঠানদি হাসলেন শিবানীর পানে চেয়ে, বললেন—অন্নপূর্ণেশ্বরি··· শিবের হাতে অন্ন দাও।

—যাও ঠানদি! কি যে বলো! কৃত্রিম কোপের ভঙ্গীতে শিবানী মুখ ফেরালো।

ঠানদি চাইলেন মহিমের দিকে, বললেন—নাও গোসাই, চেয়ে নাও প্রসাদ।

মহিমের ভঙ্গীতে লজ্জার আভাস…মহিম বললে—প্রসাদ দাও শিবানী।

শিবানী প্রসাদ দিলে, মহিম নিলে কৃতাঞ্জলি-পুটে।

ঠানদি বললেন,—জল এনে দাও গো।

শিবানী গেল জল আনতে।

তারপর প্রসাদ খেয়ে হাত ধুয়ে মহিম খুললো তার বইয়ের প্যাকেট, বললে—এই নাও ঠানদি, তুমি চেয়েছিলে আনন্দ-মঠ…

ঠানদি বই নিলেন।

মহিম চাইলো শিবানীর দিকে, বললে—তোমার বই…গীতাঞ্জলি আর ভারতবর্ষের ইতিহাস।

শিবানী বই নিলে…দুচোখে আনন্দের দীপ্তি।

ঠানদি বললেন—রেখে এসো দিদি আমার ঘরে, সেই সঙ্গে আমার বইখানাও।

শিবানী বই নিয়ে ঘরে রাখতে গেল।

মহিম বললে—আমার কথা হঠাৎ আজ মনে জাগলো কেন ঠানদি?

ঠানদি বললেন,—মনে সব সময় জেগে আছো গোসাই…তবে আজ একটু বিশেষ করে কেন, শোনো বলি :

শিবানী এসে একটু দূরে দাঁড়ালো…নির্বাক মৌন মূর্তি।

ঠানদি লক্ষ্য করলেন না, বোধ হয়। তিনি বললেন—কলকাতায় থাকো, কত ছেলের সঙ্গে জানাশোনা আছে…একটি ভালো ছেলে

স্বার্থে না দাদা, শিবুর জন্য। মেয়েটা কি সত্যিই ওর খুড়ীর বাঁদীগিরি করে কাটাবে?

মহিম প্রশ্ন করলে—এই কথা?

ঠানদি বললেন,—না। শোনো তারপর, ওর খুড়ী ক্ষেপে উঠেছে। নকুল চক্করবর্ত্তি…সে ধরেছে, তার সঙ্গে যদি শিবুর বিয়ে স্থায় খুড়ো, তাহলে মেয়েকে দেবে গা-ভরা গয়না…খুড়ীকে দেবে ষোল ভরির সোনার অনন্ত গড়িয়ে, আর ঋষি ঠাকুরপোকে দেবে এক-হাজার টাকা নগদ বিয়ের খরচ-পত্র বলে…

শুনে মহিম যেন কাঠ! নিমেষের জন্য! তারপর বললে—বলো কি ঠানদি! চারটেকে পার করেছে, এখনো বিয়ের সাধ মেটেনি? বাড়ী তো ওদিকে ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনিতে গিসগিস করছে—যেন নোয়ার আর্ক! বয়সের গাছ-পাথর নেই! চেহারায় বৃষকাঠ!

ঠানদি বললেন—মেয়েদের মুখের পানে আর মনের পানে কেউ কি তাকায় দাদা আমাদের দেশে! তুমি বলছো বৃষকাঠ…খরচের দায়ে মেয়েগুলোকে হাড়কাঠে ফেলতেও অনেক মা-বাপের বাধে না—এ-তো খুড়ী! তাই বলছিলুম দাদা, মেয়েটা ভেসে যাবে কি আমরা থাকতে?

মহিমের বুকে যেন কে পাথর চাপিয়ে দিলে! তার কাছে এই শিবানী…শিবানীও নিজেকে করেছে যেন মহিমের ছায়া!

কিন্তু কি উপায় সে করবে? নিজে অসহায় নিরুপায়! খুড়ো-খুড়ীর এত-বড় দায়…অতখানি প্রলোভন!

মহিম একটা নিশ্বাস ফেললো!

ঠানদি ভাবছিলেন। চারিদিকে অন্ধকার…হঠাৎ ঠানদির চোখ পড়লো একটু দূরে…

কে যেন দাঁড়িয়ে আছে!

জিজ্ঞাসা করলেন,—কে রে ওখানে ?

ক্রন্দনে বিজড়িত কণ্ঠ···উত্তর হলো,—আমি খেতুর মা গো বামু
পিসি···

—কি হয়েছে রে ? কাঁদছিস কেন ?

এ প্রশ্নে খেতুর মার দুঃখ-বেদনা আর বাধা মানলো না···খেতু
মাকে হিঁচড়ে টেনে কে যেন ঠানদির পায়ের কাছে আছড়ে এ
ফেললো ! হাউ-হাউ করে খেতুর মা বললে,—খেতুর বাপের আজ দুদি
বড় অসুখ গো ! গা যেন আগুনের খাপরা···শ্যামাদাস বদ্দির বড়ি এ
খাওয়ালুম, তা মিথ্যে হলো বামুন পিসি।

আশ্বাস দিয়ে ঠানদি বললেন—তা কাঁদছিস কেন ? অসুখ ি
মানুষের হয় না ?

খেতুর মা বললে—তোমার ঠাকুরের চন্নামেত্তো দাও গো বামু
পিসি, ভালো করে তোমার ঠাকুরকে বলো খেতুর বাপকে ঠাকুর ভালে
করে দিন। কদিন বেরুতে পারেনি—একটি পয়সা ঘরে নেই। স
খাবো কি ?

এত দুঃখেও ঠানদির হাসি পেলো। কিন্তু সে হাসি চেপে ঠান
বললেন—ঠাকুরের ফুল দিচ্ছি, চন্নামেত্তো দিচ্ছি—নিয়ে যা খেতুর মা
ভাবিসনে, ঠাকুরকে আমি ভালো করে বলবো, ঠাকুর সারি
দেবেন।

—হ্যাঁ মা, তাই বলো।

শিবানীকে ঠানদি ইঙ্গিত করলেন। শিবানী নিয়ে এলো ঠাকুরে
পূজার ফুল, চরণামৃত···খেতুর মাকে দিয়ে ঠানদি চাইলেন মহিমে
পানে।

মহিম উঠে দাঁড়িয়ে ছিল—যেন কাঠ। ঠানদি বললেন—পীতা
জেলে···তার জ্বর।···একটিবার যাবে দাদা ? দেখে আসবে ?

ভালো মানুষ পিতু···কারো সাতে নেই, পাঁচে নেই—পরের জন্য প্রাণ দিতে পারে বুঝি।

মহিম বললে—কেন যাবোনা ঠানদি? এখনি যাবো।

—আহা, তাই করো দাদা, মঙ্গল হবে। ডাক্তারী-বিদ্যা শিখে এই সব দুঃখী-গরীব অনাথ-অসহায়দের রোগে যদি না দেখবে, তাহলে এ-বিদ্যা শিখে লাভ?···যা রে খেতুর মা, দাদাকে সঙ্গে নিয়ে যা। দাদা ডাক্তার···কলকাতার কলেজের পাশ···খেতুর বাবাকে দেখে দাদা ওষুধ দেবে, দাদার ওষুধে সেরে উঠবে।

কৃতজ্ঞতার ভারে খেতুর মা যেন লুটিয়ে পড়বে! মুখে ভাষা নেই—দুচোখে কাকুতি আর মিনতি!

মহিম চললো খেতুর মার সঙ্গে।

শিবানী বললে—আমি তোমার সঙ্গে যাবো মহিমদা?

—তুমি! আসবে! বেশ, এসো।

শিবানী হলো সহগামিনী।

পীতাম্বরের ম্যালেরিয়া। গায়ে ঘাম হচ্ছে—জ্বরের এখন রেমিশন।

দেখে-শুনে মহিম বললে—ম্যালেরিয়া খেতুর মা, ভয় নেই। ঘাম হচ্ছে··· শেষ রাত্রে জ্বর ছাড়বে বলে মনে হয়। জ্বর ছাড়লে কাল সকালে কুইনিন দেবো। খাওয়ানো নয়, ইন্‌জেকশন্! বুঝলে, গা-ফুঁড়ে ওষুধ।

শিবানী বললে—এখানে তার সরঞ্জাম আছে তোমার সঙ্গে?

কৌতুক-ভরে মহিম বললে—নিশ্চয়। তুমি ভাবো, কলেজে আমাকে অমনি-অমনি স্কলারশিপ দেবে?

গর্ব্বে আনন্দে শিবানীর মুখ হলো উদ্ভাসিত।

খেতুর মা বললে—কতদিন লাগবে দাদা, সারতে?

মহিম বললে—তা তিন-চার দিনে সেরে যাবে। মাথায় জল-পটী দিয়ে রেখো, বুঝলে, আর পাখার বাতাস চলুক।

শিবানীর দৃষ্টি পড়লো ছোট্ট ঘরের ছোট্ট বন্ধ জানলাটার দিকে—চমকে বললে,—কি করেছো খেতুর মা! জানলা বন্ধ করে রেখেছো কেন? ঘর যেন গারদ। বলে' ক্ষিপ্র চরণে গিয়ে সে জানলা খুলে দিলে।

মহিম বললে—জানলা বন্ধ রেখো না খেতুর মা—বিশেষ রোগীর ঘরে। অসুখ হলে আলো-বাতাসের দরকার আগে! ওষুধের চেয়েও বেশী দরকার। এ-কথা মনে রেখো।

মাথা নেড়ে খেতুর মা বললে,—মনে থাকবে দাদা।

—আমরা তা হলে আসি। কাল সকালে এসে কুইনিনের ব্যবস্থা করবো।

—এসো দাদা, লক্ষ্মীটি। আমি হাপিত্যেশে পথ চেয়ে থাকবো।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসবো।

৫

পিতু জেলের বাড়ী থেকে গ্রামের পথ অনেকখানি আঁকা বাঁকা। পথের একধারে নদী, আর এক ধারে নানা জাতের গাছ বাংলার ঝোপ-ঝাড়···বট-অশথ শিমুল···পায়ে-চলা পথটুকু এ গাছের পাশ দিয়ে ও-গাছ ঘুরে চলে গেছে—যেন অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গীতে। পথ বলে পরিচয় দেবে, এমন স্পর্দ্ধা যেন তার নেই। মানুষের পায়ে পায়ে নিজেকে সে গড়ে তুলেছে।

মাথার উপর আকাশে চাঁদের ফালি। খানিকটা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে নীচে।

এই পথে ফিরছিল মহিম আর শিবানী। জীবনের কঠিন সত্য কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে এখানকার স্বপ্নময়তার মাঝখানে! দুজনের মনে বিরাম-সুখের পূর্ণ আবেশ!

দুজনে কথা হচ্ছিল। এতক্ষণ পরে একান্তে অবসর মিলেছে—মনে যত কথা জমে ছিল, প্রকাশ করবার এমন সুযোগ··

মহিম বললে—বাড়ীর গলিতে ঢুকতেই কাণে গেল তোমার গঞ্জনা—খুড়ীমার স্নেহ-ভাষণ। তাই ভাবি, মেয়েদের কত সহ্য করতে হয় বিনা-অপরাধে।

মৃদু হেসে শিবানী বললে—আমার কিছু মনে লাগে না মহিমদা, সত্যি। ক-বছর ধরে শুনে শুনে এমন হয়েছে, না শুনলে যেন হাঁফ ধরে···ভাবি, তাইতো, কি হলো আজ!

মহিম বললে—কিন্তু হাঁফ ধরবার মতন অবসর তোমার আছে?

—তার মানে?

—মানে, রোজই তো রুটিন বাঁধা আছে খুড়িমার···মানুষ যেমন স্নান করে, খায় দায় নিত্য দিন—তোমারো তেমনি চাই ভাত-ডালের মত নিত্য ঐ স্নেহভাষণ।

শিবানী হাসলো, হেসে বললে—যা বলেছো মহিমদা!

—কিন্তু ও-কথা থাক, পড়াশুনার কত দূর? ম্যাট্রিক দিতে পারবে সামনের বছর?

—বোধ হয় পারবো মহিমদা। তুমি যে সব নোট লিখে দেছ—সত্যি, বসতে পারলে একটানা অনেকখানি তৈরী হয়ে যায়, আর পরিষ্কার বুঝতে পারি। তাই ভাবি, ডাক্তার না হয়ে তুমি যদি মাষ্টারী করতে মহিমদা, তাহলে তোমার ছাত্ররা বোধ হয় কেউ কোনো কালে ফেল হতো না!

মহিম বললে,—মাষ্টার না হই, মাষ্টারের ছেলে তো। কথায় বলে বাপকা বেটা, সিপাহিকা ঘোড়া, কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া!

শিবানী শুধু হাসলো—কোন জবাব দিলে না।

অনেক দূরে কে যেন আর্ত্তনাদ করে উঠলো—হুঁ! ও-পারে। মৃত্যু-দূতের পীড়নে নিজেকে কে আর ধরে রাখতে পারেনি—শোক আর্ত্ত রবে উত্তাল হয়ে উঠেছে!

দুজনে থমকে দাঁড়ালো—উৎকর্ণ।

মহিম বললে—ওপারে শ্মশানে কে কাঁদছে।

শিবানী বললে—হুঁ।

চাঁদের যেটুকু জ্যোৎস্না পড়েছিল শিবানীর মুখে, তারি আলোয় মহিম দেখে, শিবানীর মুখ মলিন…দু চোখের দৃষ্টি উদাস!

মহিম বললে—এসো…

শিবানী বললে—বুক কেঁপে ওঠে ও-কান্নায় মহিমদা। আমি সব কষ্ট সব দুঃখ সহ্য করতে পারি, কিন্তু ঐ কান্না শুনলে…

কথা শেষ হলো না! নিশ্বাস ফেলে শিবানী চুপ করে

মহিম বললে—ভয় করছে শিবানী?

—না।

—আমার হাত ধরো না হয়।

কথাটা বলে মহিম তার ডান হাতখানা প্রসারিত করে দিলে শিবানীর দিকে।

শিবানী বললে—দরকার নেই মহিমদা। আমার ভয় করছে না।

দুজনে আবার চলতে সুরু করলো।

নীরবে যে গতি এতক্ষণ সহজ ছিল, এখন আর তেমন নেই। মাথার উপর আকাশে ক'টুকরো মেঘ কোথা থেকে ভে

এসেছে, চাঁদের মুখ মলিন। ওপার থেকে কান্নার সুর তেমনি ভেসে আসছে দীর্ঘতর হয়ে···ভাষায় পল্লবিত প্রসারিত হয়ে।

মহিম বললে—মৃত্যুর কাছাকাছি দাঁড়ালে কেবলি মনে হয়, কি বা আমাদের শক্তি! এ শক্তির আমরা দর্প করি কোন্ মুখে!

—হুঁ! শিবানী একটা নিশ্বাস ফেললো। বেশ বড় নিশ্বাস।

মহিম বললে—কি ভাবছো?

কম্পিত মৃদু কণ্ঠে শিবানী বললে—একটা রাত্রির কথা মনে পড়ছে মহিমদা।

—কোন রাত্রি?

—যে-রাত্রে বাবা মারা যান। রাত তখন প্রায় দুটো, নিশ্বাস ফেলতে বাবার কি কষ্ট···উঃ! কাকা গিয়েছিল কেষ্টনগরে। কাকা ছুটে গেল ডাক্তারের কাছে। বড় ডাক্তার···ওখানকার সিভিল সার্জেন···মাঝে মাঝে তাঁকে ডাকা হচ্ছিল। সেই দিনই বিকেলে তাঁকে আনা হয়েছিল। বিকেলে দেখে ভয়ের কথা তিনি বলেন নি। কাকা গিয়ে দরোয়ান-বেয়ারাদের খুশী করে ডাক্তারকে তুললো। তাঁকে আসতে বলায় তিনি বললেন,—দেড়শো টাকার কমে অত রাত্রে বেরুবেন না।

এই পর্য্যন্ত বলে শিবানী হাঁফিয়ে পড়লো—নিশ্বাসের চাপে কথা হলো রুদ্ধ।

মহিম বললে—নিশ্চয় তিনি বিলেতফেরত সিভিল-সার্জন?

—হ্যাঁ।

মহিম বললে—তাই। তাঁর বিদ্যার দাম তো অন্য ডাক্তারদের মতো নয়। তাঁর হলো বিলিতী বিদ্যা। তার উপর অত রাত্রে বড় ডাক্তার ঘুমোতে চান, রোগীর ভাবনা ভাবতে গেলে ওঁদের চলে না তো, তাই বেশী দাম চেয়েছিলেন।

শিবানী বললে—শোনো মহিমদা, টাকা চাওয়াই নয় শুধু—কাকাকে তিনি বললেন, নগদ টাকা হাতে পেলে তবে তিনি বাড়ী থেকে বেরুবেন। কাকা ফিরে এলো হাঁপাতে হাঁপাতে। তারপর কি করে যে টাকার জোগাড় হলো—বাড়ীতে তখন কটা টাকাই বা ছিল! জানা এক পোদ্দারের দোকান ছিল কাছে, তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে সোনার শেষ কুচিটুকু তার হাতে দিয়ে টাকা নিয়ে কাকা আবার ছুটলো ডাক্তার-সাহেবের কাছে। টাকা নিয়ে পোষাকটোষাক এঁটে ডাক্তার সাহেব এলেন—রাত তখন চারটে বেজে গেছে—আর তার আধ ঘণ্টা আগে বাবার সব শেষ!

মহিম শুনলো একাগ্র মনে, বললে—তিনি আগে থেকেই বুঝেছিলেন শিবানী···পারদর্শী ডাক্তার, তার উপর অভিজ্ঞতা আছে ···বুঝেছিলেন, যেতে যেতে রোগী হয়তো··শেষ হয়ে যাবে! তাই ব্যবসা-বুদ্ধি খাটিয়ে নিজের পাওনা নিশ্চিত আদায় করে বেরিয়ে ছিলেন! এত বিদ্যা শিখতে, তার উপর বিলেত থেকে সে বিদ্যায় পালিশ লাগাতে যে-মেহনৎ, যে-টাকা খরচ করেছেন—সেগুলো দান-খয়রাতির জন্য নয় নিশ্চয়—ব্যবসা করে ঐশ্বর্য্য গড়বার উদ্দেশ্যে তো!

নিশ্বাস ফেলে শিবানী বললে—একে তুমি ডাক্তারী বলো? এঁদের উচিত, কাবলীওলা হয়ে জন্মানো!

মহিম বললে—হয়তো তাই জন্মাতেন! রাশি-নক্ষত্রের কি রকম যোগ-বিয়োগের জন্য তা না হয়ে ডাক্তারী-টীকা কপালে এঁটে গেছে!

শিবানী আর একটা নিশ্বাস ফেললো, বললে,—তাই ভাবছিলুম, গেতুর মার কান্না দেখে তুমি দেরী করলে না তো, পীতাম্বরকে দেখতে এলে! আচ্ছা মহিমদা, যখন নামজাদা ডাক্তার হবে, তখনো এমনি মন থাকবে তোমার?

মহিম বললে—ভবিষ্যৎবাণী করবো এত-বড় প্রফেট আমি নই শিবানী, তবে মেডিকেল কলেজে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে পণ করে রেখেছি, নাম চাই না, আর ডাক্তারী বিদ্যা নিয়ে ব্যবসাও কখনো করবো না! রোগীকে সুস্থ করাই হবে আমার মিশন। দুঃখী গরীব, যারা রোগে ভুগে বিনা-চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে, তাদের বন্ধু হবো। জানো তো কবি লিখেছেন

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট···

—কবির এই বাণীকে আমি করবো আমার জীবনে আদর্শ!

শিবানী শুনলো, শুনে মুগ্ধ বিহ্বল, বললে—তোমার সঙ্গে কথা কইতে এত ভালো লাগে! কেবলি মনে হয়, মেয়ে-মানুষ হয়ে জন্মেছি—কি-বা আমার সামর্থ্য, কতটুকু বা শক্তি! পরের পায়ের নীচে মুখ গুঁজে পড়ে জীবন কাটাতে হবে! সারা জীবন···শুধু দুটো অন্নবস্ত্র আর আশ্রয়ের জন্য সব সময় ছোট হয়ে পড়ে থাকা!

মহিম বললে—ছোট? নিজেকে কখনো ছোট ভেবো না শিবানী। মেয়েরা কিসে ছোট? পুরুষ-মানুষ তাকে ছোট করে রেখেছে নিজের স্বার্থে, নিজের সুবিধার জন্য···আর তোমরাও পুরুষের কথায় ভুলে ছোট ভেবে ভেবে নিজেদের ছোট করছো! এ অন্ধ বিশ্বাস ত্যাগ করো! তোমাদের শক্তি নেই, সামর্থ্য নেই, এ-কথা আমি মানি না!

শিবানী বললে—শক্তি থাকলেও আমাদের দেশে কতটুকু বেড়ার মধ্যে আমাদের জীবন ঘেরা, বলো তো! আমার কথা ধরো···মা নেই, বাপ নেই, আমার সাধ আমি লেখাপড়া শিখবো, পৃথিবীর সব জানবো, দেখবো···কিন্তু···

বাধা দিয়ে মহিম বললে—সত্যিকারের জানবার সাধ যার থাকে সব সে ঠিক জানতে পারে। তার জানা, তার শেখা কেউ আটকাতে পারে না শিবানী।

শিবানী বললে—তুমি যে আমাকে এত বই এনে দিচ্ছ, সে বইয়ে যখন পড়ি ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের কথা, সিষ্টার নিবেদিতা মাদাম-কুরী, ঝান্সীর রাণী...ভাবি, ছোটখাটো গণ্ডী ছেড়ে সারা পৃথিবীকে এঁরা কেমন আপনার করে' পেয়েছিলেন! আর বাংলা দেশে মেয়ে হয়ে জন্মে আমার পৃথিবী কতটুকুন্! এদিকে এই নদীর ধার, ওদিকে হালদারদের পোড়ো বাড়ী বাগান! কাজের মধ্যে সংসারের খুঁটীনাটী-খুঁটে দেওয়া থেকে বাসন মাজা, গরুর জাব দেওয়া—এমনি করে জীবন কাটবে? ভবিষ্যতের কথা ভাবতে বসলে দেখি, শুধুই অন্ধকার সে অন্ধকারে পথের চিহ্ন খুঁজে পাই না মহিমদা! কিসের উপর নির্ভর রেখে এগুবো? মন আমার অস্থির হয়ে ছটফট করতে থাকে তোমাকে আমি বোঝাতে পারবো না মহিমদা! সংসারের এই কাজ-খুড়ীমার কটু-কথা···এ-সবে দুঃখ আমার তত হয় না, যত হয় পরে কি হবে, তার কোনো সন্ধান না পেয়ে!

শিবানীর কণ্ঠ হলো রুদ্ধ। বড় একটা নিশ্বাসে মন যেন বেদনার অনেকখানি আভাস বাতাসে মিশিয়ে দিলে।

মহিম শুনলো। শুনে বললে—তোমার দুঃখ আমি ব[illegible]শিবানী কলকাতায় লেখাপড়া নিয়ে থাকি, অনেক কাজ সেখানে। তার মধ্যে ভবিষ্যতের কথা আমি ভাবি। আমার সে ভবিষ্যতে তুমিও আছো শিবানী। তোমাকে ছেড়ে আমার ভবিষ্যৎ আমি ভাবতে পারি না

বিস্ময়ে শিবানীর যেন চমক লাগলো! শিবানী বললে,—সত্যি কিন্তু কি করে তা হবে মহিমদা? পাশ করে তুমি ডাক্তার হবে! কত বড় ডাক্তার। কলকাতায় থাকবে। সেখানে কত পশার। না হ

খুব বড় চাকরি করবে। তুমি থাকবে কোথায় কত দূরে, আর আমি···

কথা আবার রুদ্ধ হলো।

মহিম বললে—বলো, কি তুমি···?

নিশ্বাস ফেলে শিবানী বললে—এখানে খুড়িমার সংসার নিয়ে এমনি পড়ে থাকবো···একা নিঃসঙ্গ নিঃসহায়।

বুকে আবেগের তীব্র প্রবাহ···সে-আবেগ মহিম রোধ করতে পারলো না, বললে—কবির লেখা ভুলে গেছ

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা···?

তারপর শিবানীর হাত নিজের হাতে নিয়ে মহিম বললে—তোমার ভাগ্য আমার ভাগ্য একসঙ্গে মিশিয়ে আমরা চলবো। কবি বলেছেন,

দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি পণ!

—এ-কথা আমাদের জীবনে আমরা সার্থক করবো! তুমি আমাকে দেবে শক্তি, আমি দেবো তোমায় সাহস···

শিবানীর মনে চিন্তার বাষ্প। নিঃশব্দে চলেছে সে মহিমের সঙ্গে···

মহিম বললে—শুনলে কবির কথা?

শিবানী যেন কেমন উন্মনা! বললে—হুঁ।

—কি ভাবছো বলো তো?

শিবানী বললে—শ্রীরামচন্দ্র যখন সেতু বাঁধেন···রামায়ণে পড়েছি, কাঠবিড়ালী তখন তাঁকে সাহায্য করেছিল নাকি! এ-কথা বিশ্বাস করো

তুমি? তা কখনো সম্ভব হয়? শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং নারায়ণ, তিনি সর্বশক্তিমান···

মহিম বললে—করি বিশ্বাস। পৃথিবীতে বড়রা বড় হয় ছোটদের দৌলতে। ছোটকে···তা সে যত ছোট হোক, ছেঁটে ফেললে কেউ বড় হতে পারে না। এই যে কাঁটা-গাছ মাড়িয়ে আমরা চলছি, চলার পথকে এরা কতখানি কোমল করে' রেখেছে! এদেরো দাম আছে পৃথিবীতে।

মেঘের নীচে তৃতীয়ার চাঁদ কখন ডুবে গেছে! আকাশে শুধু একরাশ নক্ষত্র। শিবানী একটা নিশ্বাস ফেলে বললে—তুমি বড় হবে মহিমদা, নিশ্চয়! তুমি কত জানো, কত বোঝো! তোমার কথা যখন, শুনি, তখন আমারো মনে হয়, হয়তো আলোর দেখা পাবো, হয়তো চিরদিন অন্ধকারে কাটবে না আমার···

মহিম বললে—আর চিরদিন যদি আমি পাশে থেকে এমনি কথা শোনাই তোমাকে?

শিবানী বললে—তার মানে?

মহিমের কণ্ঠ কে যেন চেপে ধরলো! ক্ষণেকের জন্য। নিজেকে সংযত করে মহিম বললে—যদি বলি, চিরদিন আমরা পাশাপাশি থাকবো···আমাদের দুজনের ভবিষ্যৎ একসঙ্গে মিলে মিলে গড়ে উঠবে?

এ-কথার পিছনে কি মধুর আভাস,···তার মাথায় রক্ত ছলাৎ ক'রে উঠলো। শিবানী চাইলো মহিমের পানে। স্পষ্ট তাকে দেখা গেল না! মনে হলো, যেন এক মহীরুহ! আর তার পাশে সে যেন লতার মতো···আশ্রয় চেয়ে আকুল!

হঠাৎ মহিম চেপে ধরলো শিবানীর হাত। শিবানী চমকে উঠলো, ডাকলো—মহিমদা!

মহিম বললে—গাঁয়ের পথ ছেড়ে এ কোথায় চলেছি! সামনে নদীর বাঁক!

শিবানী শিউরে উঠলো—তাই তো! গাঁয়ের প্রান্তে এসে পড়েছে দুজনে। এদিকে আর পথ নেই। সামনে ছোট নদী বেঁকেছে—নদীর জল অন্ধকার চিরে ঝক-ঝক করছে! শিবানী চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে।

মহিম বললে—কথায় কথায় পথ ভুলে···

ঝোপঝাপের মধ্যে ক্ষীণ একটু আলোর রশ্মি চোখে পড়লো।

শিবানী বললে,—বুড়োশিবের মন্দির না, মহিমদা? ঐদিকে? ঐ তো গাঁয়ের পথ।

—হুঁ।

—কিন্তু আশ্চর্য্য, এদিকে কেউ আসে না, তবু ভাঙ্গা মন্দিরে পিদীম জ্বেলে রেখে গেল কে?

মহিম বললে—ঝোপের মধ্যে ঐ ক্ষীণ আলোর রশ্মি···ঐ প্রদীপের শিখা বুড়োশিবের ভাঙ্গা মন্দিরে···যেই জ্বেলে রাখুক, ভাগ্যে ঐ আলোটুকু ছিল, তাই পথের সন্ধান পেলুম!

শিবানীর সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ-রেখা।

নদীর বাঁকে শিবের মন্দির। এককালে হয়তো এ-মন্দিরের আদর ছিল। তারপর বহুকাল উত্তীর্ণ···মন্দির এখন জীর্ণ পড়ে আছে—শিবের বিগ্রহটুকু ভগ্নাবশেষে বিদ্যমান। গ্রামের কেউ এ মন্দিরে আসে না। কেন আসে না, কবে এ মন্দিরের দুর্দ্দশা সুরু হলো, এ সব কথা কেউ ভাবে না।

মহিম বললে—তাই হয়, শিবানী। পথে যে সত্যি চলতে চায়, তার জন্য এমনি আলো কে যেন জ্বেলে রাখে! মণিদীপ! অনির্বাণ

মণিদীপ! সে দীপের আলোয় মনের অন্ধকার যায় [illegible] মানুষ চলে ঐ আলোয় তার আদর্শের পথে। আমার কথা [illegible]—গরীব স্কুল-মাষ্টারের ছেলে! অর্থ নেই, সামর্থ্য নেই, সম্বল নেই… [illegible] আদর্শ ধরে চলেছি! এতখানি পথ কি করে আমি এলুম? আসল কথা, জীবনে একটা লক্ষ্য ঠিক রেখো শিবানী! সব অন্ধকার, সব বাধা…দেখবে, কোথায় সরে যাবে।

শুনতে শুনতে শিবানীর সর্ব্বাঙ্গে শিহরণ জাগছিল! দীপশিক্ষার দিকে চেয়ে অস্ফুট কণ্ঠে সে শুধু বললে—অনির্বাণ মণিদীপ!

মহিম বললে—হ্যাঁ, আজ অন্ধকারে বুড়ো শিবতলার আলোটুকু যেমন আমাদের পথ দেখিয়ে দিলে, ঐ আলো দেখে বিশ্বাস রাখো, বুকের মণিদীপের আলোয় এমনি করেই ঠিক-পথ পাবে! প্রদীপের এই শিখাটুকুকে বুকে যদি রাখতে পারো…ঝড়-জল-দুর্য্যোগ থেকে বাঁচিয়ে…তাহলে কিসের ভয়?

কথা শুনে শিবানীর গা ছমছম্ করছিল…সে যেন কেমন তন্দ্রাভিভূতের মতো…চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ বুড়ো-শিবের প্রদীপ-শিখার উপর…

তারপর কখন…

হঠাৎ শুনলো মহিমের কণ্ঠ…মহিম বললে,—রাত হয়ে গেছে শিবানী, বাড়ী চলো।

—যাই…যেন কত-দূর থেকে শিবানী, কথা কইলো!

মহিম বললে—কি ভাবছো?

—ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি, মহিমদা।

—কি প্রার্থনা?

—প্রার্থনার কথা কাকেও বলতে নেই। চলো…

দুজনে ফিরলো গ্রামের দিকে।

বাড়ীর দিককার মোড় বাঁকতেই দেখে, মহিমদের বাড়ীর সামনে একখানা ভাড়াটে গাড়ী আর অনেক লোকজন।

শিবানী প্রশ্ন করলো—কে এলো মহিমদা?

—হুঁ! বুঝতে পারছি না তো। বাবা গেছলেন সদর কাছারিতে···কি কাজ ছিল তাঁর সেখানে···

—কিন্তু গাড়ীতে করে তিনি···

—দেখি···

পা চালিয়ে দুজনে এলো বাড়ীর সামনে। তার আগে কানে গেল ঋষির কথা—আস্তে, আস্তে··খুব হুঁশিয়ার!

গাড়ী থেকে ধরাধরি করে কাকে নামাচ্ছে?

মহিম এলো সামনে। দেখে, তারি বাবা বনমালীকে সকলে ধরাধরি করে নামাচ্ছে। মহিমকে দেখে ঋষি বলে উঠলো—এই যে মহিম! এসো, এসো, কোথায় গিয়েছিলে? তোমার বাবার ভারী অসুখ।

অসুখ! মহিমের বুকখানা ধড়াশ করে উঠলো।

ষ্টেশনের-টিকিট-চেকার ছিলেন কাছে। তিনি বললেন—এই যে মহিম! মাষ্টার-মশাই এই তিরিশ-আপ থেকে নামলেন। নেমে আমার হাতে টিকিটখানি দিয়ে যেমন ফটক পার হওয়া, অমনি দেখি ভুম্ করে পড়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি ধরে ফেললুম। তারপর ধরাধরি করে' ওঁকে ওয়েটিং-রুমে নিয়ে এলুম। ষ্টেশনে ছিলেন রেলের ছোট-ডাক্তার বাবু। এসেছিলেন ষ্টেশন-মাষ্টার-মশায়ের ছেলেকে দেখতে। তিনি দেখে বললেন, এ্যাপোপ্লোক্সি বলে মনে হচ্ছে। চিকিৎসা করলেন। সেবা-শুশ্রূষা। তারপর জ্ঞান হলে দাদা বাড়ী আসতে চাইলেন। ডাক্তার বাবু বললেন, না, হাসপাতালে নিয়ে যাই। তখন আমি বললুম, না, না

ওঁর ছেলে মেডিকেল কলেজে পড়েন, বিকেলের টে[illegible] এসেছেন, তাই বাড়ীতেই নিয়ে এলুম।

মহিম শুনলো একাগ্র-মনোযোগে।

বনমালী-বাবুকে ধরাধরি করে’ এনে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো।

ঋষি বললে—উমাপদ ডাক্তারকে কেউ ঝাঁ করে গিয়ে ডেকে আনো একবার।

হিতৈষী কে একজন ছিল, এ-কথা শুনে তখনি ছুটলো গ্রামের উমাপদ ডাক্তারের সন্ধানে।

ঋষি প্রশ্ন করলো মহিমকে,—দাদার তো এমন কখনো হয়নি আর। না, মহিম?

মহিম বললে—না।

তারপর উমাপদ ডাক্তার এলেন। দেখাশুনা করলেন। দেখে বললেন—এ্যাপোপ্লেক্সি!

মহিম যেন পাথর হয়ে গেছে! এগজামিনের ভালো রেজাল্টের খবর শোনাবে বলে বাড়ীতে ছুটে এসেছে···যাত্রাপথে বিজয়ের সুমধুর সম্ভাবনা···জীবনে এ এক পরম ক্ষণ! আর সেই ক্ষণেই এমন বিপত্তি!

উমাপদ বললে,—তোমাকে আর বেশী কি বলবো মহিম, তুমি তো সব জানো···সেবা-শুশ্রূষা আর এ্যাবসলিউট রেষ্ট···তারপর [illegible]!

মহিম বললে,—হুঁ!

চিকিৎসা, সেবা-শুশ্রূষা চললো। গরীব-গৃহস্থের ঘরে যতখানি সম্ভব, তার কোথাও ত্রুটি রইলো না! শিবানী যেন এ-বাড়ীর সঙ্গে মিশে এ-বাড়ীর মেয়ের মতো এইখানেই রইলো কদিন! মাথায় জলপটি দেওয়া, পাখার বাতাস করা, গায়ে-পায়ে হাত-বুলোনো, বিছানা বদলে দেওয়া, ওষুধ খাওয়ানো, পথ্য, বেদানার

রস করা, কমলালেবুর রস। মহিম যেন ডাক্তার···আর শিবানী যেন তার হাতে গড়া পাকা নার্শ।

পাঁচ দিন পরে ভয়ের ভাব কাটলো। বনমালীবাবু একটু যেন স্বচ্ছন্দ হলেন। সন্ধ্যার দিকে মহিমের মা বসে মাথায় পাখার বাতাস করছিলেন, শিবানী পেয়ালায় করে' বেদানার রস এনে ডাকলো, —জ্যাঠামশাই···

বনমালী বাবু চোখ মেলে চাইলেন।

শিবানী বললে—এটুকু খেয়ে ফেলুন।

—দাও।

বেদানার রস পান করে শিবানীর হাতে পেয়ালা দিয়ে তিনি ডাকলেন—মহিম···

শিবানী বললে—ডাক্তারখানা থেকে এখনি ফিরলেন। ডেকে দেবো জ্যাঠামশাই ?

—ডেকে দেবে ?···তা···হ্যাঁ, ডেকেই দাও, মা। কথা যখন বলতেই, হবে, তখন দেরী কেন ?

শিবানী গেল মহিমকে ডাকতে।

স্ত্রীর পানে চেয়ে বনমালী বললেন—তোমাদের পথে বসিয়ে গেলুম !

চোখে জল একেবারে ছাপিয়ে এলো···স্ত্রী বললেন—কি যে বলো!

—সত্য কথা বলছি। এ-কথা তো যাকে-তাকে বলবার নয়। তোমরা ভাবছিলে আমি খুব আরামে ঘুমোচ্ছি! কোথায় ঘুম? আমি ভাবছিলুম···

স্ত্রী বললেন—এখন এ-সব থাক্ না গো।

—না, না, না, তুমি বুঝচোনা, আমার যে অসুখ···

মহিম এলো, পিছনে শিবানী। মহিম বললে—আমাকে ডাকছিলেন?

বনমালী বললেন—হ্যাঁ। তোমার মাকে বুঝিয়ে দাও, আমার এ কি অসুখ! এ অসুখে মানুষের কি হয়…

কোনমতে নিশ্বাস রোধ করে' মহিম বললে,—যদি জানেন, তাহলে এ-কথাও তো জানেন বাবা যে এ-অসুখ মারাত্মক নয়, এ-অসুখে মানুষ বাঁচে।

—তাকে বাঁচা বলে না মহিম! নড়বড়ে পায়া-ভাঙ্গা চেয়ারের মতো! তেমনি করে' বাঁচতে বলো আমায়?

এ-কথার জবাব নেই। মহিম কোনো জবাব দিলে না।

বনমালী বাবু বললেন—কত আশা করেছিলুম, তার কিছুই হলো না! শেষকালে তোমাদের পথে বসিয়ে যাচ্ছি, মহিম।

—বাবা…

—জানোনা মহিম…শোনো… সেই কথা বলবার জন্যই তোমায় ডাকছিলুম।

মহিম বললে—এখন সে সব থাক বাবা। আপনি এখন বিশ্রাম করুন।

—তাই করবো। বিশ্রামের আগে তোমাদের সব কথা জানিয়ে রাখতে চাই। নাহলে বিশ্রাম মিলবে না!

মহিম বললে—আপনার ভয় হচ্ছে, কাজ করতে পারবেন না?

—সে-ভয় মৃত্যুভয়ের চেয়েও বেশী, মহিম।

—কাজ আপনি করবেন না বাবা, বিশ্রামই করবেন। সারা জীব[ন] অনেক খেটেছেন আমাদের জন্য…খেটে আমাকে তো মানুষের মতে[া] করেছেন…খাটবার যোগ্য করেছেন। এতদিন আপনি সব ভা[র]

নিয়েছিলেন, এখন থেকে আমি সে-ভার নেবো। ছেলে বড় হলে তার উপরেই তো সব ভার পড়ে। সংসারের নিয়ম।

মা বললেন—সত্যই তো! তোমার ছেলে মানুষ হয়েছে…

বনমালী বললেন—হুঁ। কিন্তু ছেলেকে এখনো মজবুত করে তুলতে পারিনি। আর দুটো বছর যদি…

মহিম বললে—ডাক্তারী নাই পড়লুম বাবা। ডাক্তার তো সকলে হয় না। যেটুকু আমাকে তৈরী করেছেন, তাতেই আমি আপনার আর মার ভার নিতে পারবো। আপনাদের না কষ্ট হয়…তা দেখবার সামর্থ্য আমার হয়েছে বাবা।

—না, না, না। বনমালী অধীর হয়ে উঠলেন, বললেন,—শুধু অন্নবস্ত্রের কথা নয় মহিম। সেই আসল কথাই বলছিলুম…তোমাদের মাথা গোঁজবার আশ্রয়টুকুও যে আমি রাখতে পারলুম না! ভেবেছিলুম, খেটেখুটে কাজ করে' আবার সব সামলে নেবো! এতদিন কাটলো আর দুটো বছর মাত্র…ভগবান কেন এমন করলেন!

বনমালী বড় একটা নিশ্বাস ফেললেন।

মহিম ব্যাকুল কণ্ঠে নিবেদন জানালো—আপনি ভাববেন না বাবা। আপনি স্থির হয়ে থাকুন। আপনি যদি বিছানাতে পড়ে থাকেন একটু সুস্থ হয়ে, তা হলেও আমি অনেক শক্তি পাবো। আমাদের বল বুদ্ধি ভরসা…সবই আপনি।

—হুঁ, কিন্তু জানো না, কি সর্ব্বনাশ করেছি তোমাদের। এই ভিটে-জমি সব বাঁধা দিয়েছিলুম, তোমাকে বড় করে' তুলবো বলে'… তোমার পথে কোথাও না বাধা ঘটে! তারা নালিশ করেছিল…কোর্টে সেদিন অনেক খোসামোদ করেছি মহাজন বলাই মল্লিকের…তার পায়ে পর্য্যন্ত ধরেছি, দুটো মাস সময় দাও। দিলে না। ডিক্রী হয়ে গেল। বন্ধকী নালিশের ডিক্রী। এখন?

বনমালী শ্বাস টানতে লাগলেন…শ্রান্তি দুশ্চিন্তা অধৈর্য্য নিরুপায়তার ভারে! তারপর আবার বললেন—সে ডিক্রী জারি করতে কবে পেয়দা নিয়ে এসে ঘাড় ধরে বার করে' দেবে ভিটে থেকে… তখন কোথায় মাথা গুঁজবে, শুনি?

মহিম বললে—এত-বড় পৃথিবীতে মাথা গোজবার জায়গা মিলবে না, কী আপনি বলছেন বাবা?

কথাটা বনমালী বাবুর ভালো লাগলো না। তিনি বললেন - হুঁ… কি তুমি করবে, শুনি?

—একটা চাকরি নেবো দেখে-শুনে। তার উপর দুচারটে-টুইশনি। তাছাড়া এতদিন যে মেডিকেল কলেজে পড়লুম…হেল্‌থ, হাইজিন …এ-সবের সম্বন্ধে যদি বই লিখি…সে বই থেকেও তো পয়সা পাবো।

বনমালী আর পারেন না! ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বললেন,—না, না, কোনোদিকে কোনো উপায় নেই মহিম। ছেলেমানুষ…কি যে বলো!

পৃথিবীর সম্বন্ধে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন…যে গরীব, যে অর্থহীন, যতই সে চেষ্টা করুক…তার পক্ষে বড় হওয়া কখনো সম্ভব নয়, এ খুব ভালো বোঝেন।

সন্ধ্যার পর বনমালী বাবু একটু ঘুমিয়েছেন, মা রান্নাঘরে…মহিম গুম হয়ে বসেছিল উঠোনের সামনে খোলা রোয়াকে।

মাথার উপর আকাশে একটুকরো ফালি চাঁদ উঠেছে—এক-রাশ নক্ষত্র। বহুদূরে কে গান গাইছে…গানের বাণী ভালো বোঝা যায় না। মহিম বসে আছে নিঃশব্দে…যেন নিশ্চেতন!

শিবানী এসে পাশে দাঁড়ালো, বললে—মহিমদা, খাও…

নিশ্বাস ফেলে মহিম ফিরে তাকালো…শিবানী একটা রেকাবি এনেছে…রেকাবিতে কতকগুলো নারকোল নাড়ু।

শিবানী বললে—জ্যাঠাইমা দিলেন। তোমাকে খেতে বললেন।

মহিম নীরব···শিবানী আবার বললে—খাও, লক্ষীটি···

নিশ্বাস ফেলে মহিম হাত পাতলো।

শিবানী বললে—তুমি সত্যি চাকরি করবে মহিমদা? ডাক্তারী পড়া ছেড়ে দেবে?

মহিম বললে—উপায় কি শিবানী! বাবার চিকিৎসা···সংসার···

—কিন্তু তুমি যে অনেক স্বপ্ন দেখতে মহিমদা···

মুখে মলিন হাসি···নিশ্বাস ফেলে মহিম বললে—গরীবের স্বপ্ন ···চিরদিন সে স্বপ্নই থেকে যায় শিবানী।

৭

কলেজের অফিসে হেড-ক্লার্ক শিববাবুর হাতে মহিম দিলে প্রিন্সিপালের নামে লেখা চিঠি···

শিববাবু তাকে ভালোবাসেন, বললেন—কিসের চিঠি মহিম?

মহিমের বুকের মধ্যে তার সমস্ত ভবিষ্যৎ যেন হাহাকার করে উঠলো! মহিম বললে—আমার পড়াশুনা আর চলবে না শিববাবু ···চাকরির চেষ্টা দেখতে হবে। তাই কলেজ থেকে নামটা উইথড্র করতে চাই।

শিববাবুর চোখের সামনে হঠাৎ যেন সব অন্ধকার হয়ে এলো। শিববাবু বললেন—তার মানে?

মহিম তখন মানে খুলে বললে। বললে, বাড়ীতে বাবার অসুখ··· তার উপর বন্ধকী ডিক্রী! কোনো কথা গোপন রাখলো না। আবেগের আতিশয্যে কিছু গোপন রাখা গেল না।

শুনে শিববাবু খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন; তারপর নিশ্বাস

ফেলে বললেন—কিন্তু যেমন করে হোক মহিম···আর দুটো বছর···তাছাড়া চাকরিতে কটা পয়সাই বা পাবে! কি তাতে সুসার হবে সংসারের?

মহিম বললে—যতটুকু হয়···

—কিন্তু তুমি তো স্কলারশিপ পাবে···তার উপর কলেজে মাইনে লাগবে না।

—কলেজের মাহিনা ছাড়া অন্য খরচও তো আছে শিববাবু।

শিববাবু কোনো কথা কানে তুললেন না, বললেন—না, না, ইউ গিভ দী ম্যাটার মোর থট্···এ-চিঠি আমি প্রিন্সিপালকে এখন দেবো না। তোমার মতো ছেলে···কি নম্বরটা পেয়েছো বলো তো লাষ্ট এগজামিনেশনে! বলে, একদিন তুমি স্যর নীলরতন···কিম্বা সুরেশ সর্ব্বাধিকারীর মতো···না···না···না।

এ-কথার মধ্যে ঘরে প্রবেশ করলেন কর্ণেল চৌধুরী—মেডিসিনের সিনিয়র প্রোফেশর। তাঁর হাতে একটা ফাইল। ফাইলটা শিববাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে তিনি বললেন—এই নিন শিববাবু, সেই ফাইলটা।

শিববাবু ফাইল নিলেন,—কর্ণেল চৌধুরী ফিরলেন। ফিরতেই মহিমকে দেখলেন···অত্যন্ত কুণ্ঠিত মলিন মুখে দাঁড়িয়ে। কর্ণেল চৌধুরী বললেন,—এই যে মহিম···এ্যাদ্দিন দেখিনি তোমায়! তোমার হয়ে আমি তোমার রেজিষ্টার নিচ্ছি···

মহিম বললে—বাড়ী গিয়েছিলুম স্যর। বাবার খুব অসুখ।

—বটে! তা···

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই শিববাবু বলে উঠলেন—তাঁর এ্যাপোপ্লেক্সি···আর কাজ করতে পারবেন না···ওনলি আর্নিং মেম্বার···সে জন্য মহিমের আর কলেজে পড়া হবে না। প্রিন্সিপালের নামে চিঠি এনেছে···কলেজ থেকে নাম উইথড্র করবার জন্য।

কর্ণেল চৌধুরী চমকে উঠলেন। মহিম কলেজ ছেড়ে দেবে? এমন ভালো ছেলে এ্যাণ্ড উইথ সাচ্ ব্রাইট প্রসপেক্টস!...না...না...

তিনি চিঠি দেখলেন, বললেন—না...না... এ হতে পারে না। কলেজ ছেড়ে দেবে বলছো! তারপর?

মহিম বললে—একটা চাকরি-বাকরির সন্ধান করতে হবে।

—কিন্তু কি চাকরি বা পাবে মহিম? নো, নো মাই বয়, তোমার উপর আমার অনেক আশা! আমার তো ক্লাশ নেই আর, বাড়ী যাচ্ছি, এসো তুমি আমার সঙ্গে, আমি সব কথা শুনতে চাই। ইউ কাণ্ট ডিসাইড ইয়োর ফেট্ ইন্ এ্যান্ ইনষ্টাণ্ট। এসো...

মহিমকে নিয়ে কর্ণেল চৌধুরী উঠলেন তাঁর মোটরে। একটি-একটি করে বহু প্রশ্নে মহিমের পারিবারিক বিবরণ সংগ্রহ করলেন। বললেন—কিন্তু মহিম এমন কোনো আত্মীয় নেই তোমার যিনি এখন টাকা ধার দিতে পারেন? পরে তুমি সে-টাকা শোধ দিয়ে দেবে।

—টাকা কে ধার দেবে স্যর? বাড়ী ছিল...বন্ধক দিয়ে যদি বা জোগাড় হতো, তাও গেছে...মর্টগেজ-ডিক্রী!

—হুঁ! তাহলে...কিন্তু তোমার এমন কেরিয়ার...সাউণ্ড এ্যাণ্ড সিয়োর। দেশে ডাক্তারের বড় অভাব, মহিম...

নিশ্বাস ফেলে মহিম বললে—কোনো আশা দেখছি না স্যর।

—তাহলেও চিন্তা করে দেখি...বাড়ীতে বসে ভাবি। হঠাৎ কিছু করে বসো না।

গাড়ী ঢুকলো ফটকে। কর্ণেল চৌধুরী নামলেন। মহিমও নামলো তাঁর সঙ্গে। পথ থেকে নেমে কটা সিঁড়ি। তারপর চওড়া ল্যাণ্ডিং... দুদিকে ঘর। ডাহিনে কর্ণেল চৌধুরীর ষ্টাডি...বাঁয়ে পেশেণ্টদের দেখবার কামরা... সামনে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়।

ল্যাণ্ডিংয়ে উঠে শুনলেন দোতলার ঘরে চীৎকার...দড়াদ্দড় প্লেট

ডিশ আছড়ে ভাঙ্গার শব্দ···বেয়ারা-বাবুর্চির দল ভীত ত্রস্ত দাঁড়িয়ে সিঁড়িতে···

প্রশ্ন করলেন,—ব্যাপার কি ?

উত্তর শুনলেন,—মিশিবাবা···বহুৎ গোঁসা···

—হুঁ ! মৃদু হাস্যে মৃদু কণ্ঠে বললেন—ষ্টর্ম এ্যাহেড। দেখি। তারপর মহিমের পানে চেয়ে বললেন—ষ্টাডিতে বসো মহিম। আমি এখনি আসছি।

মহিম গিয়ে ষ্টাডিতে বসলো। কর্ণেল চৌধুরী উঠলেন দোতলায়।

সামনে মিসেস চৌধুরী। তাঁকে প্রশ্ন করলেন—আজ আবার কি হলো ?

বিরক্তি-ভরে গৃহিণী বললেন—হওয়া-হওয়ির কিছু দরকার থাকে তোমার মেয়ের ? আদর দিয়ে দিয়ে মাথাটা খেয়েছো···এখন বোঝো মজা···

—আহা, হলো কি, শুনি না ?

মিসেস বললেন—হবে আবার কি ! বেলা দুটোর সময় চাউশ একখানা পুরোনো মোটরে চড়ে একপাল মেয়ে এসে হাজির···বলে, পিকনিকে যাবে সকলে। আমি বললুম, না, যাবে না। তাতেই মেয়ে একেবারে রণরঙ্গিণী হয়ে নৃত্য সুরু করলেন। খাবেন না, দাবেন না। বেয়ারারা চা-খাবার নিয়ে গেল···তাদের শুধু মারতে বাকী···দড়াদ্দম্ প্লেট-কাপ-ফেলে মেয়ে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করছে।

কর্ণেল চৌধুরী বললেন—আহাহা, জানো তো ও একটু অভিমানী ! একটু হিউমর করলেই···

মিসেস বললেন বিরক্তি-ভরা কণ্ঠে—করো গে তুমি হিউমর, আমি পারবো না। পেটের মেয়ে···তার মন রেখে চলতে হবে···

মনিবের মতো ? কারো পানে চাইবে না! কাকেও মানবে না! নিজের যা খেয়াল হবে, তাই করবে! এত কি মেয়ের জেদ!

কর্ণেল চৌধুরী বললেন—আচ্ছা, আমি দেখছি···

—হ্যাঁ, ভাখো গে···মেয়ের পায়ে ফুল-চন্দন দাও গিয়ে। ঐ মেয়ের বিয়ে কি করে হয়, আমি তখন দেখবো···সত্যি মরবো না।

কথা আর না বাড়িয়ে কর্ণেল চৌধুরী মেয়ের ঘরের বাহিরে এলেন। দ্বার ভিতর থেকে বন্ধ···দ্বারে ধাক্কা দিলেন।

ভিতর থেকে ঝঙ্কার উঠলো—আবার এসেছিস! এই না বকে তাড়িয়ে দিলুম···

কর্ণেল চৌধুরী বুঝলেন, এ-ঝঙ্কার বেয়ারা-বাবুর্চিদের উদ্দেশে। তিনি বললেন—আহাহা, আমি···আমি···মা-মণি···আমি!

ভিতর থেকে দৃঢ় স্বরে জবাব এলো—তুমি তো কি! আমি দরজা খুলবো না।

—আহা, শোনো না মা-মণি, রাগ করতে আছে ?···লক্ষীটি, দরজাটা একবার খোলো।

—না···খুলবো না।

কর্ণেল চৌধুরী চাইলেন দরজার সামনে···ভাঙ্গা প্লেট-কাপের টুকরো পড়ে। বেয়ারাকে বললেন,—এগুলো তুলে নে···কার পায়ে ফুটবে!

বেয়ারা ভাঙ্গা প্লেটের কুচি কুড়োতে লাগলো·· কর্ণেল আবার দ্বারে করলেন আঘাত···দরজা খুলে গেল। কর্ণেল বুঝলেন, মর্জি হয়েছে···মেয়ে নিঃশব্দে দ্বার খুলে দেছে।

তিনি ঘরে ঢুকলেন। ঢুকে দেখেন, ঘরের মেঝেয় কার্পেটের উপর ভাঙ্গা পিরীচ-গেলাসের কুচি। মেয়ে কেউটের মতো চক্র তুলে বসে আছে।

বললেন—তুমি নাকি রাগ করেছো? হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক?

মুখ ফুলিয়ে মেয়ে বললে—আমার খুশী, আমি যদি না খাই!

কর্ণেল বললেন—সে তো সত্যি···খাওয়াটা হলো নিজের খুশীর ব্যাপার। খেতে যদি ইচ্ছা না হয়, তাহলে খেতে বলা অন্যায়। আমি তোমাকে খেতে বলছি না মা-মণি। আমি শুধু জিজ্ঞাসা করছি, রাগটা হলো কেন আজ?

মেয়ে তুললো ঝঙ্কার—বড় হয়েছি···এখনো সব তাতে শাসন! সব তাতে মানা! একটু বেড়াতে যাবো, তাতেও অনুমতি নিতে হবে।

কর্ণেল বললেন—সত্যি! তা···

মেয়ের পানে চাইলেন। মেয়ে মুখ গোঁজ করে বসে আছে!··· বাপের পানে দৃষ্টি নেই। বাপ তখন দ্বারের দিকে ইঙ্গিত করলেন। বেয়ারা ছিল দাঁড়িয়ে, ইঙ্গিত পাবামাত্র চাকা-টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

মেয়ে দেখলো। দেখে আবার জ্বলে উঠলো। বললে,—ফের এসেছিস···হতভাগা বেহায়া!

বেয়ারা হতভম্ব! কর্ণেল ব্যস্ত হয়ে বললেন—আহা, ও তোমার খাবার নয়, আমার! কলেজ থেকে এলুম, খাবো না? খিদে পেয়েছে আমার।

কাপটা তুলে বেয়ারাকে ইঙ্গিত জানালেন। বেয়ারা পেয়ালায় ঢাললো কোকো। কর্ণেল কোকোর পেয়ালা মুখে তুললেন। এক সিপ নিয়ে বললেন—বাঃ! খাশা তো! কি কোকো রে? ভারী চমৎকার টেষ্ট···তেমনি ফ্লেভর। বলে' পেয়ালাটা মেয়ের দিকে ধরে বললেন—দেখবি একটু চেখে?

মেয়ের দুচোখে ভ্রূকুটি···লক্ষ্য করে' কর্ণেল বললেন—আহাহা,

তোমাকে খেতে বলছি না আমি! খেতে তোমার ইচ্ছা নেই যখন, তখন কেন খেতে বলবো? তা নয়! শুধু এর ফ্লেভরটা!

মেয়ে কাঠ...কর্ণেল চায়ের পেয়ালাতে আবার মুখ দিলেন, বললেন—আজ তাড়াতাড়ি ছুটি হলো, ভাবলুম, একবার মার্কেটে যাবো ...লালারাম ক'দিন এসে জ্বালাতন করছে! বলছে, ভালো ভালো সিল্ক এনেছে...প্যারিস-সিল্ক...নতুন নতুন ডিজাইন! তা তোমার তো ষ্ট্রাইক...কাকে নিয়েই বা যাবো?

মেয়ের চোখে সলজ্জ দৃষ্টি...মৃদু কণ্ঠে মেয়ে বললে,—মার্কেটে যাবে? সত্যি?

—না। একলা আর কি করবো গিয়ে? সিল্কের মর্ম্ম আমি কি বুঝি!

মেয়ের দুর্জ্জয় মান চকিতে মিলিয়ে গেল...বাতাসে মেঘ যেমন মিলিয়ে যায়, তেমনি! মেয়ে বললে,—আমি যাবো, বাবা।

—তুমি যাবে! কিন্তু যেতে হলে খেতে হবে...

ঘরে নিবিড় স্তব্ধতা। সলজ্জ মৃদু ভাষে মেয়ে বললে,—আমি খাবো!

—অল রাইট্! তাহলে খেয়ে নাও। তারপর দুজনে মার্কেটে যাবো...কেমন?

মেয়ের ঠোঁটে হাসি...মেয়ে বললে,—হ্যাঁ।

কর্ণেল বললেন—আমি তাহলে নীচে যাচ্ছি। তুমি খেয়ে নাও। বাইরে আমার একটু কাজ আছে, সেরে নি! তারপর যাবো... কেমন?

মেয়ে মাথা নেড়ে বললে—হুঁ।

ষ্টাডিতে মহিম বসে আছে...খোলা খড়খড়ি দিয়ে বাহিরে আকাশ দেখা যাচ্ছে, সেই আকাশের পানে চেয়ে! একটা পাখী

উড়ছে···মহিম ভাবছিল, কি সুখী ঐ আকাশের পাখী! ওকে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে হয় না!

কর্ণেল এলেন। মহিমের জন্য চা এলো, জলখাবার এলো।

এবং মহিমের সঙ্গে নানা কথায় কর্ণেল আরো জানলেন, মহিমের এখনো বিবাহ হয়নি। বললেন—তাহলে ফ্যামিলি-মেম্বার তোমরা তিনজন! তোমার বাবা, মা আর তুমি!

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

কর্ণেল কি ভাবলেন, তারপর বললেন—আচ্ছা মহিম, তুমি যখন বিবাহ করোনি, তোমাকে বেশী ভার বইতে হবে না তো!

মহিম বললে,—তাহলেও চাকরি ছাড়া আমার আর অন্য কোনো উপায় নেই!

কর্ণেল আরো কি ভাবলেন। তারপর বললেন,—ভাবছি, আমি যদি তোমার বাবাকে একদিন দেখতে যাই?

বামন যেন চাঁদ পাবে হাতে! মহিম বললে—আপনি যাবেন স্যর?

কর্ণেল বললেন,—হ্যাঁ, একটা রবিবারে···

—আপনার অনুগ্রহ!

—না, না, অনুগ্রহ নয়। এ আমার কর্তব্য! তোমার বাবার অসুখ ···তুমি আমার ছাত্র! আচ্ছা, ধরো, যদি সামনের রবিবারে যাই?

—বেশ।

৭

বনমালীবাবুর সঙ্গে কর্ণেল চৌধুরীর অনেক কথা হলো। মহিমের মা বরেণ্য-অতিথির জন্য রান্নাঘরে খাবার তৈরী করছিলেন···কচুরি, পানতুয়া···লুচি। গ্রামের গৃহিণীর যেটুকু পটুতা আছে, তার উপর

নির্ভর করে মা তৈরী করছিলেন ; আর শিবানী তাঁর ফরমাশ খেটে, ময়দা মেখে-বেলে নানা ভাবে সাহায্য করছিল।

চিকিৎসা আর পথ্য সম্বন্ধে দরদ-ভরা আলোচনা করলেন কর্ণেল চৌধুরী। বনমালী মাষ্টারের বুক কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে। কর্ণেল চৌধুরী আশ্বাস দিয়ে বললেন—বুঝলেন, ওষুধ যা ব্যবস্থা করছি, সেই ওষুধ। আর প্লেন ফুড। আপনি চা খান না নিশ্চয় ! গ্রামে এখনো ও বিষ ঢোকেনি। পুকুরে টাটকা মাছ পাওয়া যায় খাশা…সেই টাটকা মাছের ঝোল…গরুর টাটকা দুধ…ব্যস ! এ-দুটি বস্তুর কাছে বিলিতি কোনো টনিক লাগে না ! ও-দুটির মতো হেল্‌থ্-রেষ্টোরার আর লাইফ-গিভার আর নেই।…কি বলো মহিম ?…

কথাটা বলে কর্ণেল চৌধুরী ঘড়ি দেখলেন, বললেন—পাঁচটা সাতচল্লিশে আমার ট্রেণ না মহিম ?

মহিম বললে—আজ্ঞে, হাঁ।

কর্ণেল বললেন—তাহলে আর বসা চলে না তো।

বনমালী বাবু ব্যস্ত হলেন, বললেন—ওঁর চা আর জলখাবার—ভাখো মহিম।

কর্ণেল চৌধুরী বললেন—ও-সব আবার কেন ?…না, না…

বনমালী বাবু সসঙ্কোচে বললেন—আপনার যোগ্য আয়োজন করবো, সে সামর্থ্য আমার নেই ! সামান্য বিদুরের খুদ…

হেসে কর্ণেল চৌধুরী বললেন—কিন্তু জানেন তো, বিদুরের খুদ সামান্য বস্তু নয়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পরম-সমাদরে তা গ্রহণ করেছিলেন।…তা বেশ, আপনি বলছেন যখন…ব্যবস্থা করো মহিম…খেয়েই যাবো। আর অমনি একখানা গাড়ী আমার জন্য…ষ্টেশনে যাবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বলে' মহিম গেল ঘর থেকে বেরিয়ে।

বনমালী বাবু বললেন—আপনার অসীম অনুগ্রহ। আপনার পায়ের ধূলো আমার বাড়ীতে পড়বে, এ আমার আশার অতীত!

একটা সিগার ধরিয়ে তাতে দুটো টান দিয়ে কর্ণেল চৌধুরী বললেন—সৌজন্যও নয়, অনুগ্রহও নয় বনমালী বাবু। মহিমকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি। ওর সঙ্গে অন্য ছেলের তুলনা হয় না। শো মডেষ্ট, *সিন্‌সিয়ার…এ্যাণ্ড সাচ্ একসেপ্‌সনাল মেরিট!* জানলেন বনমালী বাবু, হাসপাতালে অন্য ছেলেরাও ডিউটি করে, মহিমও ডিউটি করে। ও গিয়ে দাঁড়ালে রোগীর রোগ অর্দ্ধেক প্রায় সেরে যায়। হাসপাতালে শুধু ডিউটির সময় ডিউটি করা নয়—ডিউটি নেই, তবু ও প্রত্যহ যায়, রোগীদের খবরাখবর নেয়। আশ্চর্য্য দরদ মশায়…এ্যাণ্ড হোয়াট সেন্স অফ রেশপন্‌সিবিলিটি! ডাক্তারিকে ইদানীং আমরা আখমাড়া কল করে তুলেছি…তার চেয়ে এ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে যদি বলি কাবলীওলার পেশা! কি করে প্যাঁচ মেরে' পয়সা আদায় করবো! সেই জন্যই আপনার দারুণ কষ্টের কথা শুনে আমারো দুর্ভাবনার সীমা নেই। শুনলুম, মহিমকে কলেজ ছেড়ে চাকরিতে ঢুকতে হবে! আমি কিন্তু চাই…আর দুটো বছর হী শুড্ বী স্পেয়ার্ড আদার্ ট্রব্‌ল্‌স্।

বনমালী বাবু বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, রোগের ভাবনার চেয়ে ঐ ভাবনাই আমার আরো বেশী মারাত্মক হয়েছে।

—আপনার এ ভাবনা যাতে ঘোচে, সে সম্বন্ধে আমিও দিন অনেক চিন্তা করেছি বনমালী বাবু। চিকিৎসার ব্যবস্থা করবার আগে আপনার মনকে এ দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি দেওয়া চাই, নাহলে চিকিৎসা পণ্ডশ্রম হবে!

মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলে বনমালী বললেন—আপনি ঠিক কথা বলেছেন। কিন্তু…

কর্ণেল চৌধুরী সিগারে আর একটা টান দিয়ে বললেন—আমাকে

সন্তান আছে বনমালী বাবু। সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে বাপের মন কতখানি আকুল হয়, আমি তা বুঝি। তাই বাপের মন নিয়েই···ওয়েল, আই ক্যান কোয়ায়েট মেজার ইয়োর থট্‌স্···তাই আপনাকে আমি কিছু বলতে চাই !

সকৌতূহলে বনমালী চাইলেন কর্ণেলের পানে।

সিগারে আর একটি টান···কর্ণেল বললেন—মানে, আমার একটি মেয়ে আছে। আমার ঐ এক সন্তান। সুন্দরী···হেল্‌দি···তাকে এডুকেশনও দিয়েছি, একালে যেমন দেওয়া উচিত। মেয়ে ডাগর হয়েছে ···এখন তার বিয়ে দিতে চাই। কিন্তু দিতে পারছি না, তার কারণ কোথায় অজানা কার হাতে দেবো, কি তার মনের পরিচয়! তার উপর আপনার কাছে খুলে বলতে দ্বিধা নেই···ঐ এক-সন্তান বলে মেয়েকে···মানে, যেমন হয়ে থাকে···উইক্‌নেস অফ্ ফণ্ড ফাদার্স··· মেয়েকে হয়তো একটু বেশী আদর দিয়েছি! তার ফলে মেয়ে একটু খেয়ালী···আপনারা যাকে বলেন, সেল্‌ফ্-উইল্‌ড্! অর্থাৎ তাকে একটু হিউমর করে চলুন, শী ইজ অল রাইট্। কে এখন তাকে বুঝে আপন করে নেবে, বলুন? সেজন্য আমার মস্ত দুর্ভাবনা! তাই মানে, আমার ইচ্ছা ..

ঠিক এই মুহূর্ত্তে শিবানীর প্রবেশ। তার এক হাতে প্লেট···প্লেটে নানা রকম খাবার, আর এক হাতে চায়ের পেয়ালা। দুজনকে কথোপ-কথনে নিযুক্ত দেখে শিবানী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো···তার কাণে কর্ণেল চৌধুরীর কথাগুলো প্রবেশ করতে লাগলো যেন ছর্‌রা!

কর্ণেল চৌধুরী বলছিলেন—আমার ইচ্ছা, মহিমের হাতে আমার মেয়েকে যদি দিতে পারি···অবশ্য সে ইচ্ছা আপনার অনুমতি-সাপেক্ষ···

বনমালীর মনে হলো, চোখের সামনে থেকে যেন কালো মেঘের

পর্দ্দা গেছে সরে, চারিদিক যেন আলোয় আলো! এ কথার কি জবাব দেবেন তিনি?

হঠাৎ চোখ পড়লো শিবানীর উপর…বললেন—ও! শিবানী! চা এনেছো! আচ্ছা মা, ঐ টেবিলে রাখো, রেখে হাত ধোবার জল আর একখানা ফর্শা তোয়ালে…

যেন দম-দেওয়া পুতুল…চা আর খাবারের প্লেট রেখে শিবানী নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

কর্ণেল চৌধুরী বললেন—আমার ঐ এক মেয়ে! বাড়ী-গাড়ী টাকা-কড়ি যা হোক কিছু করেছি! সে সব পাবে জামাই আর আমার মেয়ে। মহিমকে মেডিকেল কলেজ ছাড়তে হবে না। তারপর পাশ করে বিলেত যেতে চায়…মেডিকেল সার্ভিস কিম্বা ফর্ স্পেশাল্ ষ্টাডিস্…আমি পাঠিয়ে দেবো! তার ভবিষ্যৎ উন্নতির ফেসিলিটি আমি তাকে দেবো সর্ব্বতোভাবে!

শিবানী আবার এলো…হাতে জলের গ্লাস আর তোয়ালে।

কর্ণেল চৌধুরী তখন আবেগের ভরে বলছেন—বুঝলেন বনমালী বাবু, আমরা দুই বাপ…দুজনেই আমরা সন্তানের মঙ্গল চাইছি! চাইছি আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ হোক কোয়ায়েট সেফ্ এণ্ড সিকিয়োর!

বনমালী একাগ্র মনোযোগে শুনলেন…কোনো জবাব দিলেন না; শুধু একটা নিশ্বাস ফেললেন।

কর্ণেল চৌধুরী আবার বললেন—এ সম্বন্ধে আপনার মত পেলে আমি…

হঠাৎ আবার বনমালীর চোখ পড়লো শিবানীর দিকে, বললেন—ও, জল এনেছো!

তারপর তিনি চাইলেন কর্ণেলের দিকে, বললেন—জল আর তোয়ালে এনেছে। মুখ-হাত ধুয়ে তাহলে ঐ বিদুরের খুদটুকু…

—বটে! বটে! বলে উচ্চ হাস্য করে কর্ণেল চৌধুরী বললেন—বিদুর

এমন খুদ যোদ্ধা চোখে ভাখেননি! খাবো কিন্তু তার আগে আপনার অনুমতি···

বনমালী বললেন—আপনি চাইছেন অনুমতি! আশ্চর্য্য! আমি কি বলবো, বুঝতে পারছি না···মনে হচ্ছে, আমার দারুণ দুর্দ্দিনে ভগবানের বেশে আপনি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন···আমার মনের আকুল প্রার্থনা বুঝে। আপনার এ অনুগ্রহ··

কর্ণেল বললেন,—অনুগ্রহ-নিগ্রহ ও-সব সেন্টিমেণ্ট আমি বুঝি না বনমালী বাবু। আই হ্যাভ বীন এ প্রাকটিকাল ম্যান অল মাই লাইফ! আমার মেয়েকে মহিমের জন্য নেবেন বলে' আমায় কথা দিন আগে··· আপনার অনুমতি···

বনমালী বললেন—আমি আপনার কন্যাকে নেবো কি, কর্ণেল সাহেব! আপনার মেয়েকে নেবার সামর্থ্য আমার আছে? তা নয়! আমার মহিমকে আপনি নেবেন, এ আমার তপস্যার ফল। হ্যাঁ, জল এনেছে···মুখ-হাত ধুয়ে এখন···

—ও হ্যাঁ, হ্যাঁ··· আচ্ছা, দাও জল।

শিবানী নিঃশব্দে গ্লাস ধরলে···গ্লাসের জলে হাত ধুয়ে··· তোয়ালেয় হাত মুছে কর্ণেল ফিরিয়ে দিলেন গ্লাস আর তোয়ালে। সেগুলো নিয়ে শিবানী আবার চলে গেল।

কর্ণেল চা-পানে মন দিলেন।

রান্নাঘরে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো শিবানী। মা তখন দুখানি রেকাবিতে জল-খাবার সাজাচ্ছেন। শিবানীকে বললেন,—তোর আর মহিমের জল-খাবার সাজিয়ে রাখছি মা। মহিম এসে গেলে দুজনে বসে খাবি। এত করলি-কর্ম্মালি, না খেয়ে গেলে আমি ভয়ানক রাগ করবো কিন্তু।

শিবানী জবাব দিলে না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো · যেন পাথর হয়ে গেছে !

মা বললেন—চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন রে ? অসুখ করছে ?

—না···

দূরে একখানা গাড়ীর শব্দ। শিবানীর চমক ভাঙ্গলো ! দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলো···ও শব্দ কাছে···আরো কাছে এগিয়ে আসছে !

আকাশের পানে চোখ পড়লো···আকাশে মেঘ জমছে···

বাহিরে গাড়ী থামলো। গাড়ীর দরজা খুলে কে নামলো। শিবানী বুঝলো···মহিম। গাড়ীর দরজা আবার বন্ধ হলো। তারপর মহিমের স্বর কাণে ভেসে এলো—গাড়ীখানা ঘুরিয়ে রাখো আবদুল।

শিবানীর সমস্ত দেহ-মন চিরে যেন বিদ্যুতের একটা শিখা ছুটে গেল ! শিবানী রোয়াক থেকে উঠানে নামলো···তারপর এলো সদরে···

মহিমের সঙ্গে দেখা। মহিম বললে—বাড়ী যাচ্ছো ?

শিবানী বললে—হ্যাঁ···তুমি শীগগির যাও মহিমদা···তোমার যে বিয়ে !

—বিয়ে !

—হ্যাঁ। রাজকন্যা···সেই সঙ্গে অর্দ্ধেক রাজত্ব! শিবানীর স্বর কম্পিত···যেন বাষ্পে ভেজা।

কথাটা বলে' শিবানী দাঁড়ালো না, বাড়ীর দিকে চললে বেশ ত্বরিত পায়ে।

মহিম যেন আকাশ থেকে পড়েছে ! তার বিয়ে ? সে স্তম্ভিত··· কিন্তু চকিতের জন্য। তারপর ডাকলো—শিবানী···শিবানী···

দু-পা অগ্রসর হলো শিবানীর দিকে। শিবানী ফিরলো না, গতি আরো দ্রুত করলো। শুধু বললো,—না, না, না···আমি এখন শুনতে পারবো না···পারবো না···আমার সময় নেই !

কথার সঙ্গে সঙ্গে গতি আরো দ্রুত করে' সে চলে গেল।

যেন ঝড় বয়ে গেল! মহিম বিস্ময়ে অভিভূত!

বাড়ী ঢুকতে হলো। ঢুকে সে এলো একেবারে বনমালীর ঘরে, এসে বললে—গাড়ী এসেছে।

—ও! কর্ণেল চৌধুরী সপ্রতিভ হলেন, বনমালী মাষ্টারের দিকে চেয়ে বললেন—তাহলে গিয়েই আমি ব্যবস্থা করতে পারি?

কৃতজ্ঞতায় গদগদ কণ্ঠ···বনমালী বললেন,—হ্যাঁ···নিশ্চয়।

—আচ্ছা। কর্ণেল চৌধুরী চাইলেন মহিমের পানে। বললেন, —আমি তাহলে আসি মহিম। না, না, তোমাকে আর ষ্টেশনে যেতে হবে না···আই উড কাম্ অল রাইট!

শিবানী বাড়ী ফিরলো। সেখানেও তার ভাগ্য-বিধাতা বিরূপ হয়ে যে-ব্যবস্থা করছিলেন···অর্থাৎ বৃদ্ধ পাত্র নকুল চক্রবর্ত্তী ষোল ভরির সোনার অনন্ত রঙ্গস্থলে এনে শিবানীর খুড়িকে দেখিয়ে তাকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করেছে এবং নকুল আর খুড়ি দুজনে মিলে বেচারী ঋষিকে এমন ব্যূহবদ্ধ করেছে যে ঋষির শান্তি নয় শুধু, প্রাণও বিপন্ন। আকুল কণ্ঠে ঋষি বলছে,—চক্করবর্ত্তীর বয়সের কি গাছ-পাথার আছে! জেনে-শুনে মেয়েটার সর্ব্বনাশ করবো!

খুড়ী ঝঙ্কার তুললো—কিসের এত ভয়, শুনি? পুরুষের আয়-পয় নির্ভর করে স্ত্রীর পয়ে। ঐ দাশু দত্তর ছেলে···পঁচিশ বছর বয়স··· জোয়ান···পয়সা-কড়ির সীমা নেই, বিয়ের পর দুমাস কাটলো না, দুদিনের জ্বরে মারা গেল! আর আমার বাপের বাড়ীর পাশে থাকে কুমুদ মিত্তির···পঞ্চান্ন বছর বয়সে তৃতীয়-পক্ষ মারা যেতে চতুর্থ-পক্ষ করেছিল···জানো, সেই কুমুদ মিত্তিরের বয়স এখন বাহাত্তর···চতুর্থ-পক্ষ

তার কোলে মাথা রেখে সিঁদুর আর শাঁখা নিয়ে সেদিন মারা গেছে। আর কুমুদ মিত্তির এখনো যেন লোহার ভীম !

সায় দিয়ে নকুল বললে—এই ! এই ! আমার কুষ্ঠি দেখিয়েছি ঋষি··· কুষ্ঠিতে শুধু পঞ্চম-পক্ষ লেখেনি, লেখা আছে, বিরেনব্বই বছর বয়সের আগে যমের বাবাও আমার টিকি ছুঁতে পারবে না !

এত আশ্বাসেও ঋষির মন থই পাচ্ছিল না, সে কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে' রইলো।

তার স্তব্ধ ভাব দেখে খুড়ী বললে—তোমার ঐ বুড়ো-ধাড়ী ভাইঝীর জন্য আনো তাহলে তপ্তকাঞ্চন তরুণ রাজপুত্তুর পাত্তর, আমি দেখি, কোথা থেকে আনতে পারো ! আমি মোদ্দা ঐ সোমত্ত মেয়েকে আর চৌকি দিতে পারবো না···মেয়ে তো নয়···গনগনে আগুন যেন।

এই সংলাপের মধ্যে মঞ্চে এসে দাঁড়ালো শিবানী।

খুড়ীর চক্রান্ত শিবানী জানতো। মহিমের জন্য [illegible] তার অভিভাবকদের শুভ কামনা···এখানে শিবানীর এই ! [illegible] আর পারে না !

দুম্ করে' শিবানী বলে উঠলো—তুমি অমত করো না কাকা, বিয়ের ঠিক করো। সত্যি, আমাকে আর কত কাল পুষবে ?

—ব্যস ! ব্যস ! ব্যস !—নকুল নেচে উঠলো !—কুমারী স্বয়ংবরা হয়েছেন ঋষি, আর কিসের চিন্তা ! জানো, সাবিত্রী এনেছিলেন সত্যবানকে যম-দ্বার থেকে ফিরিয়ে···

শিবানী দাঁড়ালো না,···ছুটে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

বাহিরে আকাশে ঘনঘটা···উঠোনে আনন্দের হাট। শিবানী ঘরে থাকতে পারলো না, বেরিয়ে এলো। নকুল তখন মহা-উৎসাহে ঋষিকে নিয়ে বেরুচ্ছে, বলছে—এখনি···না, না, দেরী নয়, এক হাজার টাকা গুণে নিয়ে আসবে, চলো। আর ফর্দ্দ···

ওদিকে বনমালী মাষ্টারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল মহিমের। মহিমকে তিনি কর্ণেল চৌধুরীর মহত্ত্বের কথা বলতে বাকী রাখেননি। তাঁর স্নেহ, তাঁর মমতা মহিমের উপর এত বেশী যে একটি মাত্র কন্যাকে মহিমের হাতে দেবার জন্য কর্ণেল চৌধুরী বনমালীর মতো সামান্য মানুষের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা জানাতে এসেছেন!

এ কথা মহিমের ভালো লাগলো না। মহিম বললে,—না বাবা, এ বিয়ে হতেই পারে না।

—কেন পারে না? এ ভগবানের দয়া, মহিম···

—না বাবা, পরের অনুগ্রহ আমি চাই না।

—এর মধ্যে অনুগ্রহটাই দেখছো মহিম? স্নেহ ভালোবাসা···

মহিম বললে—যে স্নেহে, যে ভালোবাসায় মর্য্যাদা যায়···সে স্নেহ নিতে আমার মন চায় না। আমার জন্য নিজেকে আপনি খাটো করবেন না বাবা।

বনমালী বললেন,—কিন্তু আমাকে খাটো দেখছো কোন্‌খানে? আমি ওঁর দোরে যাইনি মহিম, দয়া প্রার্থনা করতে! উনিই এসেছেন আমার দোরে।···তাছাড়া আমি ওঁকে কথা দিয়েছি।

মহিম বললে—তাঁকে বলবেন, আমি আপনার অবাধ্যতা করেছি, আপনার কথা অমান্য করেছি!

বনমালী বললেন—তুমি জানোনা মহিম, একদিন আমারো মনে কত আশা ছিল! কত স্বপ্ন আমি দেখতুম নিজের সম্বন্ধে···মানুষ হবো—দশজনের একজন হবো! নিজের জীবনে যা পারি নি, তোমার জীবনে তা সফল করবো বলে' সারা জীবন আমি শুধু যুদ্ধ করে চলেছি মহিম···নিজের জন্য কোনো-কিছু কামনা করিনি···কোনো দিকে চাইনি। আজ আমি শ্রান্ত, রোগে জীর্ণ···অক্ষম···

মহিম কোনো জবাব দিলে না, চুপ করে' রইলো।

বনমালী বললেন—দুঃখ নিয়েই চিরদিন বেঁচেছি মহিম···সুখও আজ চাইছি না। সুখের আশাটুকু! সেই আশাটুকু নিয়ে যেতে চাই শুধু, এই আমার ইচ্ছা! তোমার কাছে আমার এ ইচ্ছার কোনো দাম নেই? তুমি ছেলে···এটুকু প্রত্যাশা বাপ হয়ে তোমার কাছ থেকে আমি করতে পারি না? বলো···বলো···

মহিমের চতুর্দ্দিকে যেন আগুন জ্বলছে! বাপের সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক চলে না! বিশেষ ওঁর এই শরীর···

মহিম আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছিল···

বনমালী বললেন—বলে' যাও, আমায় বলে যাও মহিম···

মহিমের মনে হলো, বাপ যেন আগুনের ড্যালা ছুড়ে মারলেন! বুকে বাজছে শিবানীর সেই কথা—রূপসী রাজকন্যা···অর্দ্ধেক রাজত্ব···

মহিম দাঁড়াতে পারলো না। পাগলের মতো বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে কেমন অভিভূতের মতো মহিম এসে দাঁড়ালো শিবানীর বাড়ীর সম্মুখে···নকুল আর ঋষির সঙ্গে দেখা।

মহানন্দে নকুল বললে,—সব ঠিক হয়ে গেল বাবা মহিম··· কথাবার্ত্তা পাকা, তোমাদের নতুন জ্যাঠাইমা এনে দিচ্ছি আবার।

মহিম অবাক! হতভম্বের মতো বললে,—নতুন জ্যাঠাইমা!

নকুল বললে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঋষির ভগ্নী শিবানী গো!

শিবানী! মহিম চাইলো ঋষির পানে।

অপরাধীর কুণ্ঠিত স্বরে ঋষি বললে,—শিবানী মত দেছে বাবা। নাহলে···

মহিম প্রতিধ্বনি তুললো,—শিবানী মত দেছে?

—হ্যাঁ বাবা···এখনি···এই মাত্র।

নকুল চাইলো মহিমের পানে, বললে,—কলকাতায় বসে থাকলে

চলবে না। এসে সব করতে-কর্ম্মাতে হবে। বুঝলে বাবা মহিম, এই আমার শেষ কাজ! যজ্ঞি যা করবো...যাকে বলে, বৃষোৎসর্গ! এসো ঋষি, বৃষ্টি আসছে।

ওরা চলে গেল···মহিম কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

অনেকক্ষণ। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে ঢুকলো সে ঋষির বাড়ীতে। ওদিকে দূরে কোথায় বাজ পড়লো ক-ক-ক্ড়াৎ।

৮

সামনে দেখা শিবানীর সঙ্গে। শিবানী গোয়াল থেকে বেরুচ্ছে, মহিমকে দেখেও সে চলে যাচ্ছিল···যেন তাচ্ছল্য-ভরেই!

মহিম ডাকলো,—শিবানী···

শিবানী দাঁড়ালো নিঃশব্দে।

মহিম কাছে এলো, বললে,—তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

—আমার সঙ্গে!

—হ্যাঁ।

—আমার সঙ্গে আবার কি কথা তোমার!

ভূমিকা না করে মহিম বললে,—এ কথা সত্য···যা শুনছি? তোমার···

—হ্যাঁ।

—ঐ নকুল চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে?

—হ্যাঁ।

—তুমি নিজে মত দিয়েছো?

—দিয়েছি! কেন দেবো না? পরের অনুগ্রহ নিয়ে বাঁচতে হবে চিরকাল?

—তা বলে ঐ বুড়ো নকুল চক্রবর্ত্তী ?

—উনি ছাড়া কেই বা আর আমাকে বিয়ে করবে ? মা নেই, বাপ নেই, অর্থ নেই, সহায় নেই ! তুমিই বলো না···এর পরে কোথায় কার দোরে গিয়ে দাঁড়াবো দুটি অন্ন আর একটু আশ্রয়ের প্রত্যাশায় ?

মহিম চুপ করে রইলো···কিছুক্ষণ। তারপর বললে,—সেদিন মন্দিরের সামনে আমাদের সে-কথা··· সে-কথা তোমার মনে পড়ে না ?

—পড়ে। কিন্তু সে-কথার কি দাম ?

—সে তবে ?

—ভুল···মিথ্যা···

—কিন্তু আমাকে ভুল বুঝোনা শিবানী !

—কিছুই ভুল বুঝিনি আমি···কিছু আর বুঝতেও আমি চাই না।

—তাহলে আমারো কিছু বলবার নেই ! কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ একবার···

কথা শেষ হলো না। শিবানী বললে—আমার ভবিষ্যৎ আমি নিজে দেখে নিতে পারবো। সে ভাবনা তোমার ভাববার প্রয়োজন নেই !

শিবানী চলে যাচ্ছিল, মহিমের কি মনে হলো, সে শিবানীর হাত ধরলো, ডাকলো,—শিবানী···

জোর করে' শিবানী হাত ছাড়িয়ে নিলে, বললে—হাত ধরো না মহিমদা। লোকে দেখলে নিন্দে করবে।

—নিন্দে !

—হ্যাঁ, নিন্দে। তোমার সঙ্গে এভাবে···না, না, তুমি···তুমি যাও মহিমদা, এখান থেকে চলে যাও তুমি ! আমার সঙ্গে এমন করে আর দেখা করো না—কোনো কথা বলো না আমায়···

—বেশ···একটা নিশ্বাস ফেলে মহিম চলে গেল···এদিকে আর ফিরেও তাকালো না।

শিবানী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো আকাশের বুকে মেঘের হুঙ্কার··· মহিম গেল চোখের আড়ালে মিলিয়ে !

শিবানী ডাকলো—মহিমদা···মহিমদা···

তারপর সে আর চুপ করে থাকতে পারলো না—ছুটলো মহিমের উদ্দেশে।

ঝড় এলো। ভীষণ ঝড়···ডাল-পালা দুলিয়ে নেড়ে রাজ্যের ধূলো-বালি উড়িয়ে প্রচণ্ড বেগে ঝড় এলো।

সে-ঝড় ঠেলে শিবানী চললো···ডাকতে ডাকতে—মহিমদা, মহিমদা···

মহিম ওদিকে বাড়ী ঢুকলো। দরজা-জানলাগুলো ঝড়ের নাড়ায় ভয়ের সাড়া তুলে কাঁপছে যেন !

বাড়ীর দোরে এসে শিবানী···ডাকলো—মহিমদা···

সাড়া নেই ! ঝড় শুধু বিকট হুঙ্কার তুলে ফুলে ফুঁশে উঠছে, শিবানীকে যেন ঠেলে ফেলে দেবে···দরজা খুলবে না !

শিবানী ফিরলো।

ফিরে বাড়ী গেল না···ঠানদির ওখানেও নয় ! সে চললো ঝড়ের বেগে···দিকবিদিকে লক্ষ্য নেই···সোজা···সোজা···সোজা···

বৃষ্টি নামলো অঝোর-ধারে। শিবানীর ভ্রূক্ষেপ নেই। চলে চলে সে এলো জঙ্গলে।···চেতনা ফিরতে দেখে, সেই ভাঙ্গা মন্দির।

মন্দিরে সেই প্রদীপের আলো ! শিবানী এসে বুড়ো শিবের মন্দিরে আছড়ে পড়লো। আকুল আর্ত্ত কণ্ঠে ডাকলো,—ঠাকুর · ঠাকুর, আমার যে আর কিছু রইলো না !

বাহিরে প্রলয়ের দুর্যোগ···শিবানীর বুকেও তেমনি দুর্যোগ ! দু'চোখে শ্রাবণের ধারা···শিবানীর মন উচ্ছ্বসিত আবেগে আর্ত্ত রব তুলেছে—এমন করে' আমার আকুল প্রার্থনা তুমি চূর্ণ করে দিলে ঠাকুর !

এ কি হলো ! এ কথা আমার মুখে কি করে বেরুলো !...এ অভিমান আমার মনে...মহিমদা, মহিমদা আমার মুখের কথা শুনে চলে গেলে ! এ কথা বিশ্বাস করলে তুমি ? ঠাকুর...ঠাকুর আমার উপায় ?

ঝড়ের দাপটে মন্দিরের দীপ গেল নিভে...অন্ধকার। শিবানী চীৎকার করে উঠলো—তোমার আলোটুকু নিবিয়ে দিলে ঠাকুর ! কি করে' কারে আমার পথ খুঁজে পাবো ?

মন্দিরে বুড়ো শিবের পিছনে চুপ করে কে বসেছিল...এ-কথা শুনে সে বলে উঠলো—মন্দিরে কে পথ খোঁজে গো ?...

শিবানী চমকে উঠলো...বললে—কে ?

কম্পিত স্খলিত স্বর !...

জবাব শুনলো—আকাশ-বাণী নই ! আমি মানুষ !

শিবানীর যেন সম্বিত ফিরলো...পরিচিত কণ্ঠ ! আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে শিবানী বললে,—রাজেনদা !

—হ্যাঁ শিবানী, আমি রাজেনদা...কিন্তু ব্যাপার কি ? বাং... ...শের মেয়ে...এ সময় স্বামী-পুত্র নিয়ে সংসার করবে...তা নয়, মন্দিরে এসে পথ খুঁজচো !

শিবানী বললে—দুটি অন্নের জন্য পরের দোরে যাকে প... ...কতে হয়, তার দুঃখ তুমি বুঝবে না রাজেনদা !...কিন্তু তুমি এ পথে ?

—হাঁ। এই পথই আমার পক্ষে প্রশস্ত। স্বদেশী-মার্কা-মারা দাগী, সদর রাস্তায় পুলিশের কড়া পাহারা...সে রাস্তায় চলবার উপায় নেই বোন, দেখলেই ধরে নিয়ে গিয়ে সরকারী ধর্ম্মশালায় পুরবে ! মোদ্দা তুমি এখানে ?

শিবানী নিরুত্তর।

রাজেন বললে,—বুঝেছি, বড় বেশী আঘাত পেয়েছো ! কিন্তু তাতে কাতর হলে তো চলবে না শিবানী। দেশে তোমার লক্ষ-লক্ষ ভাইবোন

কত দুঃখ পাচ্ছে···পেটে এক-মুঠো অন্ন পায় না, পরনে বস্ত্র নেই···রোগে ওষুধ পায়না, পথ্য পায়না···মানুষ হয়ে মানুষের মত বাঁচতে পারছে না—তাদের এই আকাশ-জোড়া দুঃখের পাশে তোমার দুঃখ কতটুকু···ভেবে দেখেছো ?

শিবানী বললে—আমি এই দেশেরই মেয়ে রাজেনদা · অন্ন আর পরনে বস্ত্র না জুটলেও সুখী হতে জানে এ দেশের মেয়ে।···কিন্তু সব আশা-ভরসায় যে বঞ্চিত, তার দুঃখ কতখানি আকাশ জুড়ে ওঠে···

কথা শেষ হলো না। রাজেন বললে—তবু এ দুঃখ তোমার বিলাসী মনের! যে-দেশের পুরুষরা গোলাম, সে দেশের মেয়েরা তো বাঁদী। বাঁদীর আবার আশা-আকাঙ্ক্ষা কি, শিবানী ? এর মধ্যে কি করে তুমি সুখের আশা করো ? তোমার দুঃখ তোমার ঐ লক্ষ-লক্ষ ভাইবোনের দুঃখে মিশিয়ে দাও। নিজের দুঃখের ছোট গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আটকে রাখলে দুঃখ কোনোদিন ঘুচবেনা! তার চেয়ে তোমার দুঃখ তোমার ভাইবোনদের দুঃখের পাথারে মিলিয়ে দিতে পারো যদি, তাহলে দেখবে তোমার দুঃখের চিহ্ন থাকবে না।

শিবানী কি ভাবলো, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বললে—কিন্তু সামান্য মানুষ আমি, কি করতে পারি রাজেনদা ?

—যতটুকু পারো! এই গোলামির বাঁধন কাটবার জন্য যে সংগ্রাম আজ সুরু হয়েছে, এতে তোমাদের কি কিছু করবার নেই ? কিন্তু বৃষ্টি থেমেছে···বৃষ্টি দেখে মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলুম। কালকের মধ্যে আমায় কলকাতায় পৌঁছুতে হবে। যাবার আগে চলো তোমায় এগিয়ে দিয়ে যাই।

শিবানী বললে—কিন্তু আমার যে আজ কোথাও জায়গা নেই রাজেনদা।···আমায় তুমি সঙ্গে নেবে ?

—তার মানে ? রাজেনের স্বরে প্রচুর বিস্ময়।

শিবানী বললে—সত্যি আমায় পথ দেখিয়ে দাও রাজেনদা, যাতে দুঃখ ভুলতে পারি, আমি বাঁচতে পারি।

রাজেন বললে—দুঃখ ভোলবার পথ হয়তো দেখিয়ে দিতে পারবোনা, তবে দুঃখ জয়ের পথ…

—তাই করো রাজেনদা, সেই পথই আমায় দেখিয়ে দাও।

—কিন্তু তোমার বাড়ীতে?

নিশ্বাস ফেলে শিবানী বললে—কেউ ভাববেনা রাজেনদা, ভাববার কেউ নেই আর আমার!

—এসো তাহলে…

তারপর সেই রাত্রির অন্ধকারে শিবানী কোথায় মিলিয়ে গেল… গ্রামে তার চিহ্ন রইলো না আর!

দ্বিতীয় অধ্যায়

১

বারো বছর পরের কথা বলছি :

মানুষ অনেক-কিছু গড়তে চায়···কিন্তু কোথা দিয়ে অদৃশ্য কোন্ শক্তির ক্রিয়া চলে, গড়া তার হয়না ! ··জীবনে আমরা অনেক স্বপ্ন দেখি··· মনে কল্পনার লহর বয়ে যায়—কিন্তু কজনের স্বপ্ন সফল হয় ? কত কল্পনাই না আকাশ-কুসুমের মতো ঝরে পড়ে !

মহিম স্বপ্ন দেখতো···সুখময় জীবন, শান্তি ! পয়সার উপর তেমন লালসা নেই। গরীবের ঘরে জন্ম··গরীবের ঘরে যেটুকু পেয়েছে, তাতেই তার অভাব গেছে মিটে। কারো কাছে কোনো অভিযোগ জানায়নি কোনো-দিন ! ছোট গণ্ডীটুকু শুধু প্রসারিত করবে, এর বেশী আশা-আকাঙ্ক্ষা কোনোদিনই তার ছিল না ! সে আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ছিল, ছোট গৃহ ···কোলাহল থাকবেনা, শান্তি আর আরাম···এবং পাশে শিবানী ! কিন্তু —শিবানী নিজে বলেছে, নকুল চক্রবর্ত্তীকে বিবাহ করবে ! তাকে শ্লেষে বিঁধে বলেছিল···রূপসী রাজকন্যা ··অৰ্দ্ধেক রাজত্ব !

সে-শ্লেষ কেন ?

বাড়ীতে ফিরে মহিম বুঝেছিল। অনেক পরে···সে গিয়েছিল শিবানীকে বলতে বোঝাতে, অপরে যদি এমন কিছু আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন, তাতে তার কি বলবার আছে ? সে তার নিজের কথা বলতে গিয়েছিল কিন্তু শিবানী সে-কথা শুনলো-না ! রূঢ় সম্ভাষে মহিমকে বিদায় দেছে ! কেন ? কেন ?

তারপর···

কোথায় হলো নিরুদ্দেশ!···নকুলের সম্বন্ধে তার সে-কথা···

মহিম সে-কথা বিশ্বাস করেনি। সে বুঝেছিল, নিশ্চয় এর-মধ্যে চক্রান্ত আছে! সে চক্রান্তের কথা মহিমকে কেন জানালো না? বিশেষ, কদিন আগে বুড়ো শিবের মন্দিরে যে-কথা হয়েছিল, তা থেকে দুজনেই তো বুঝেছিল দুজনের মন!

অভিমানে দুঃখে বেদনায় মহিম নিজেকে দিলে বিসর্জ্জন! বাপ বুঝলেন না মহিমের মন! বাপের অত-বড় অসুখ···তিনি মহিমের কাছে প্রত্যাশা রাখেন! বেশ, তাই হোক! জীবনে মানুষ অনেক কিছু ত্যাগ করে··· অনেক সাধ, অনেক আশা···সেও দেবে বিসর্জ্জন তার আশা আকাঙ্খা আদর্শ···সব-কিছু।

তাই পিতার ইচ্ছায় সে করলো বিবাহ কর্ণেল চৌধুরীর একমাত্র কন্যা ললিতাকে। তার মন চূর্ণ হয়ে গেল! শুধু ভাবলো, দুনিয়ায় সে যেন কেউ নয়! জীবনে তার কাজ শুধু ঋণ-শোধ··পিতার ঋণ।

পাশ ভালো করেই করলো মেডিকেল কলেজ থেকে। স্ত্রীর মনের সঙ্গে পারলো না মনকে মেশাতে! বিলেত গেল। ভাবলো, স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে গিয়ে মনকে নতুন পরিবেশের জন্য তৈরী করবে। ফিরে এসেও পারলো না স্ত্রীর সঙ্গে মিশে এক হতে! স্ত্রীর মন যা চায়, সে সবে মহিমের মন তৃপ্তি পায়না। হাসি নাচ গান পার্টি পিকনিক্···সবে তার মন অভ্যস্ত নয়! বিবাহ করে যে-সমাজের সঙ্গে তার পরিচয় হলো, সে-সমাজে মানুষের হাসি পরিমিত, কথা বুক থেকে আসেনা— কথার উৎস কণ্ঠ! কৃত্রিমতার ছাঁচে-ঢালা জীবন! মনে চললো ভয়ানক রকম দ্বন্দ্ব! নিরুপায় ভেবে নিজেকে এ সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার অনেক চেষ্টা করলো মহিম, কিন্তু পারলো না নিজেকে এ-সমাজের ছাঁচে গড়ে তুলতে! তার জন্য স্ত্রীর মুখে মৃদু গঞ্জনা··ক্রমে সে-গঞ্জনা শ্লেষের উৎসে বর্ষিত হতে লাগলো! সে শ্লেষ মহিমের দারিদ্র্য নিয়ে গ্রামের

আবহাওয়ায় তার বড় হওয়া নিয়ে ! শেষে এ্যারিষ্টোক্রেশির সংস্পর্শে এসেও গেঁয়ো মহিম মানুষ হলো না···এমন কথাও ললিতা অবাধে বলতে লাগলো ।

পাশ করে প্র্যাকটিস্···কলেজ তাকে সাদরে গ্রহণ করলো প্রোফেশর হিসাবে। মহিম তখন প্র্যাকটিস আর কলেজ নিয়ে যতখানি পারে, শ্বশুর-বাড়ীর বিলিতি ছোঁয়াচ্ বাঁচিয়ে দূরে দূরে থাকে। এমন অবস্থায় বনমালী মাষ্টারের মৃত্যু এবং স্বামীর শোকে মহিমের মাও হলেন স্বামীর অনুগামী। ওদিককার সব সংযোগ গেল ছিন্ন হয়ে···মহিম আর-একবার বিলাত গেল আরো শিক্ষা-লাভের আশায়···চিকিৎসার আধুনিক সব প্রণালী শিখতে।

ফিরলো দু'বছর পরে পিতা বনমালী এবং শ্বশুর কর্ণেল চৌধুরীর জীবনের আশা সফল করে' ! অচিরে তার কেরিয়ার হলো ব্রিলিয়ান্ট ! এবং সম্ভ্রম···অর্থ মহিমকে অভিনন্দিত করে তুললো ।

প্রাকটিশে মহিম নিজেকে ডুবিয়ে দিলে। ধনী-দরিদ্র সব লোককে দেখে সমান চোখে। গরীবের কাছ থেকে মহিমের ফীয়ের কোনো তাগিদ নেই—তিনবার ডেকে কেউ দেয় চারটে টাকা···কেউ বা অশ্রু-ভরা চোখে মিনতি জানায়! মহিম তাতেই খুশী! ওদিকে ধনীর ধন নিতে কিছু মাত্র কার্পণ্য করে না! মনে এখনো সেই দুর্জ্জয় অভিমান! মহিমের বাবা বিয়ে দিলেন, মহিম বড় হবে, দারিদ্র্যের যে দুর্ভোগ তিনি সয়ে গেছেন, মহিমকে যেন যে দারিদ্র্য না ভোগ করতে হয়! কর্ণেল চৌধুরী চেয়ে ছিলেন জামাইয়ের গৌরব! পিতাকে কর্ণেল তাঁর শেষ সময়ে আরাম দিয়েছিলেন—দুশ্চিন্তার দায় থেকে উদ্ধার করে' । তাঁর কাছেও মহিমের ঋণের সীমা নেই! পিতার ঋণ···শ্বশুরের ঋণ···নিজের জীবন দিয়ে সেই ঋণ-পরিশোধ···এ ছাড়া জীবনে তার আর কোনো লক্ষ্য নেই !

যে-সব স্বপ্ন দেখতো, শিবানীর উদ্দেশে অভিমান প্রকাশ করে বলে, তুমিই দিলেনা আমাকে সে-স্বপ্ন সফল করে' তুলতে !···ভুল বুঝে আঘাত হেনে চলে' গেলে—যেখানেই থাকো, শুনতে পাবে, মহিম ডাক্তার খুব পয়সা রোজগার করছে, তার মস্ত খাঁই। সে-স্বপ্নের কথা তোমার মনে যদি জাগে, যদি প্রশ্ন করো—তোমার সে স্বপ্ন মহিমদা ? তাহলে আমি তার জবাব দেবো—কে কোথায় স্বপ্ন সফল করতে চায় ? তুমি ? তুমিও বলেছিলে যে-কথা সেদিন সেই আবেগ-ভরা কণ্ঠে···

বাড়ীতে রোগীর ভিড় লেগে আছে। একা পারে না, দুতিনটি জুনিয়র এ্যাসিষ্টাণ্ট আছেন। তাঁদের ভাগ্যও মহিমের ছোঁয়া পেয়ে সোনায় মণ্ডিত হয়ে উঠছে। দুবেলা এই সব রোগীকে মহিম নিজে যত্ন করে দেখে—এ-কাজে তিলমাত্র ঔদাস্য নেই, ক্লান্তি নেই। একটি ছেলে হয়েছে···খোকন। এই খোকন তার প্রাণ। ললিতার মা মারা গেছেন মহিম বিলাত থেকে ফেরবার পর। কর্ণেল চৌধুরী রিটায়ার করেছিলেন—পত্নীর মৃত্যুর পর এখান থেকে বিদায় নিয়ে তিনি চলে গেলেন শিলঙ···নির্জ্জনে বাস করবেন। সারা জীবন শুধু রোগের চিকিৎসা করেছেন, জ্ঞান-সমুদ্রের ধারেও ঘেঁষেননি, এখন কিছু পড়ার ইচ্ছা আছে···পড়াশুনা নিয়ে বাকী দিনগুলো কাটিয়ে দিতে চান।

সেদিন ছিল মহিমের বিবাহের বার্ষিকী তারিখ। ললিতার বন্ধু আর বান্ধবীরা মিলে বিপুল উৎসবের আয়োজন করেছে···মহিমকে নোটিশ দেছে—সেদিন খুব বেশী কাজ চলবে না—একটি দিন সকলের খাতিরে ছুটী নিতে হবে। বেলা দশটায় বেরুনো···শপিং সেরে তার পর বাহিরে লাঞ্চ! সেখান থেকে খুব খানিক ঘোরা ষ্টীমারে। তারপর সন্ধ্যায় কোনো সিনেমায় যাওয়া। সেখান থেকে বাড়ী ফিরে 'ডিনার'—

ডিনার শেষ হলে মুন্-লাইট্ মাস্কারেড···অর্থাৎ বেলা দশটা থেকে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত নন্-ষ্টপ্ মেরি মেকিং···গ্যালা ফেষ্টিভিটিজ্।

বেলা দশটা বাজে···ঘরে রোগীর ভিড় তেমনি···ললিতা বেশভূষা করছে বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, এমন সময় আয়া ধরে নিয়ে এলো খোকনকে···খোকন প্রাণপণে হাত-পা ছুড়ছে মুক্তি পাবার আশায়।

আয়া এসে নালিশ জানালো মেম-সাহেবের কাছে—খোকন মানা না শুনে সামনে ঐ খোলা মাঠে গিয়েছিল—বস্তীর যত ছেলে মিলে ফুট-বল খেলা করছে, গিয়ে তাদের সঙ্গে খেলবে।

মেম-সাহেব চটে উঠলো। এত বড় স্পর্দ্ধা! তার ছেলে মিশবে গিয়ে ঐ ছোট লোকদের সঙ্গে! ছেলের পানে চেয়ে সগর্জ্জনে মা বললে—এ কথা সত্য খোকন? তুমি ঐ সব ছোটলোকের সঙ্গে বল খেলতে চাও!

পাঁচ বছরের ছেলে খোকন বললে—হ্যাঁ, আমি ওদের সঙ্গে খেলবো।

—বটে! ওদের সঙ্গে খেলবে! মস্ত চড় পড়লো খোকনের পিঠে—সঙ্গে সঙ্গে ধমক,—মিশবে ওদের সঙ্গে?

—হ্যাঁ, মিশবো।

—এখনো হ্যাঁ!···প্রহার চললো বেয়াদব ছেলের অঙ্গে।

বাইরে থেকে একখানা মোটর এসে নীচে পর্চে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে বিলাসিনী-কণ্ঠে হাসির উচ্ছ্বাস!

ললিতা যেন সচেতন হলো! আয়াকে বললে,—বেবিকো লে যাও নার্শারিমে। তোম লোক্ তঙ্কা খাতা, কাম্‌মে ফাঁকি চালাতা! বেবিকো দেখনে সক্‌তা নেহি। ফিন বেবি যায়গা তো তোমরা তঙ্কা কাটা যায়গা··· জরিমানা হোগা। যাও, লে যাও বেবিকো।

—আও বেবি! বলে' আয়া পাকড়ালো খোকনকে। খোকন হাত-পা ছুড়তে লাগলো···সেই সঙ্গে আবদার—আমি খেলতে যাবো মাঠে··হ্যাঁ, ওদের সঙ্গে খেলা করবো।

আয়া বললে—বেবি শুনতা নেহি মেম-সাব!

—না শোনে, নোকরি ছেড়ে চলে যা! দোশরা আয়া রাখবো।

এ কথার পর আয়া আর কোনো কথা বললে না, খোকনকে নিয়ে চলে গেল তার নার্শারিতে।

পার্লর রুমে কলকল্লোল···মিষ্টার পাকাড়শী বললে,—ললিতা দেবী দেখছি লেট্!

রেবা বললো,—সত্যি লিলি ব্যাপার কিরে? বলে যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই! এখনো হয়নি তোর? বেলা দশটা বেজে গেছে যে।

—কামিং···কামিং··বলতে বলতে সজ্জিত বেশে ঘরে ঢুকলো ললিতা। বললে,—লেট বলতে চান্ মিষ্টার পাকড়াশি?

ইভা বললে—ডক্টর রয়? রোগীর ভিড় দেখলুম তো ঘরে এখনো···

ললিতা বললে—তাঁকে আমি খবর দিচ্ছি—

বলে' একটা শ্লিপে লিখলো—সকলে এসেছেন। তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। বেলা দশটায় বেরুবার কথা, মনে আছে নিশ্চয়।

ডাকলো—বয়··

বয় এলো। ললিতা বললে—সাবকো দেও যা'কে।

—জী! বয় চলে যাচ্ছিল, ললিতা বলে দিলে,—জবাব লে আও।

—জী! বয় চলে গেল।

এক-ঘর অতিথি··মহিলা ও পুরুষ···সৌখীন সমাজের! ললিতা বললে—কি খাবি বল্ ইভা? লিমন-স্কোয়াশ্? মিষ্টার তরফদার টী? দুখানা পেষ্ট্রি?

পাকড়াশী দিলে জবাব—একটু যখন ওয়েট করতে হবে ডক্টর

রয়ের জন্য, তখন মন্দ কি! যা হয় কিছু··জাষ্ট টু কীল্ টাইম!'

—বেশ। রামদীন···

আর একজন বয় এলো। ললিত বললে—লিমন-স্কোয়াশ ওঁর চা লাও···ওঁর পেষ্ট্রি...

—জী। রামদীন গেল আদেশ পালন করতে।

গল্প সুরু হলো। রেবা বললে,—জানিস, কাল ভাই চক্করবর্ত্তি সাহেবের ওখানে গিয়েছিলুম··ডিনার ছিল···তা মিসেস চকরবর্ত্তি যা সেজেছিল! বয়স তো পঞ্চাশে··ছাড়ালো, এখনো ঠোঁটে লিপষ্টিক আর লাল রঙের জর্জেট পরেছিলেন। বাঁধানো দাঁত নিয়ে তাঁর সে অভ্যর্থনা···কি কষ্টে হাসি চেপেছিলুম, তোকে আর কি বলবো!

ললিতা বললে—মিসেস চকারবর্টি আর আমার মা শুনেছি এক-বয়সী!

পাকড়াশী বলে উঠলো—এ তোমাদের অন্যায় রেবা! ওঁর যদি সাজবার ইচ্ছা হয়, বয়সের সঙ্গে সে ইচ্ছাও বিসর্জ্জন দেবেন, এমন কোনো আইন নেই!

ইভা বললে—আইন না থাকলেও মানুষের একটা আক্কেল তো থাকে! ছাখো না···

কথায় বাধা পড়লো প্রথম বয়ের পুনঃ-প্রবেশে। ললিতা বললে—জবাব মিলা?

—জী, নেহি। সাব বোলা, ফুরশৎ নেহি! মেম-সাবকো যানে বোলো।

ললিতার ভ্রূ কুঞ্চিত হলো···মুখে কথা ফুটলো না।

আক্ষেপ জানিয়ে, ইভা বললে—সত্যি, এ ভারী অন্যায় কিন্তু। আমরা অত করে' বলে গেলুম, একটা দিন ছুটি ডক্টর রয় আমাদের খাতিরে···,

রেবা বললে,—বিশেষ আজকের দিনে···এ ডেট্ সেক্রেড্ ইন লাইফ!

ললিতার মনে কথাগুলো বিঁধলো ছুঁচের মতো! একটা নিশ্বাস ফেলে ললিতা বললে—তোরা ভাখ। আমি তখনি বলেছিলুম, ও কি মানুষ! না, ম্যানার্স জানে!

আভা বললে,—কিছু মনে করিস নে ভাই লিলি, এ আমার অনেক দেখা। মানে, আমাদের বাপ-মা শুধু গেজেট দেখে গরীবের ঘর থেকে ছেলে ধরে এনে যেখানেই মেয়ে ধরে দেছে, সেইখানেই এমনি ব্যাপার। তেলে-জলে মিশ খায় কখনো? ঐ যে সুধীরা·· মিষ্টার বটব্যাল যত-বড় পণ্ডিত প্রোফেশর হোন্, সো ক্লামশী! সুধীরার স্বামী বলে' মানতে পারবো না কোনোদিন।

তরফদার বললে,—মানুষ লেখাপড়া শিখলেই মানুষ হয়? না, ম্যানার্স শেখে? বিশেষ আমাদের সোসাইটিতে! হুঃ।

কথা নয়, যেন মর্ম্মভেদী বাণ! ললিতার অসহ্য বোধ হলো। দরদ দেখিয়ে সকলের এই অনুকম্পা! সম্পূর্ণ নির্বিকার ভাব দেখিয়ে ললিতা বললে—আমার জানা ছিল, ও আসবে না।

—কিন্তু আজকের দিনেও···

—ওঁর কাছে সব দিন সমান। তাছাড়া পয়সার অভাবের মধ্যে মানুষ হয়েছে তো! এখন পয়সার মুখ দেখছে। পয়সার গোলামিই জীবনে সর্ব্বস্ব বলে জানে।

রেবা বললে,—যা বলেছিস সত্যি।

ললিতার মনের মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে! এ-সব কথা সে আগুনকে আরো উস্কে দিলে। সে বললে,—চলে আসুন মিষ্টার পাকড়াশী।

ধুপদাপ করে সকলে নামলো নীচে।

তরফদার বললেন—কিন্তু প্র্যাকটিশ যা গড়ে তুলেছেন ডক্টর রয়, রিয়ালি এনভিয়েব্ল্।

রেবা বললে—ডাক্তার হিসাবে ওঁর যা নাম…

ইভা বললে—স্যর নীলরতন ছাড়া এতখানি নাম কৈ আর কারো হয়েছিল বলে শুনিনি।

গাড়ীতে সকলে উঠে বসলো…তরফদারের গাড়ী…প্যাকার্ড। তরফদার বললে—প্রথমে তা হলে মার্কেট…গজমল ছগমলের সিল্ক-মার্ট।

ইভা বললে—নিশ্চয়।

নার্শারি-ঘরের খড়খড়িতে গরাদের ওদিকে মলিন মুখে দাঁড়িয়ে খোকন …ছুটি চোখে করুণ দৃষ্টি! তার সে-দৃষ্টির সামনে দিয়ে প্যাকার্ডে চড়ে সকলে চলেছে আমোদ করতে! আর খোকন…

২

ললিতারা সদলে যখন বাড়ী ফিরলো…মহিমের গাড়ী দাঁড়িয়ে পর্চ্চে।

ইভা বললে—ডাক্তার সাহেব বাড়ী ফিরেছেন।

তরফদার বললে,—সিনেমায় তাহলে ওঁকে সঙ্গী পাবো হয়তো!

রেবা বললে—দেখুন একবার সন্ধান নিয়ে…চেম্বারে হয়তো রোগী আছে…

সকলে তাকালো ললিতার দিকে। ললিতা যেন কাঠ…সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত নির্বিকার ভাব!

তরফদার এগিয়ে চললো চেম্বার লক্ষ্য করে…

ললিতা একটি কটাক্ষ নিক্ষেপ করলো সেই দিকে…তারপর বললে—তোরা ছাখ…পায়ে ধরে সাধতে হয়, সেধে রাজী করা। আমি ভয়ানক টায়ার্ড…স্নান না করলে সোয়াস্তি পাবো না।

ঘোষাল বললে,—আমিও একবার স্নান করতে চাই, মিসেস রয়।

—আসুন। বেয়ারাকে বলি, আপনার ব্যবস্থা করে দেবে দোতলায় ওঁর বাথ-রুমে।

তরফদার দাঁড়ালো চেম্বারের বাইরে।

চেম্বারে রোগীর সঙ্গে মহিমের কথা হচ্ছিল। মহিমের কণ্ঠ শোনা গেল। মহিম বলছে—টাকা—টাকা—টাকা—এই করে বেড়ালেই সুস্থ থাকতে পারবেন না শেঠজী। ময়দানে রোজ একটু করে' বেড়ানো চাই—সকালে সন্ধ্যায় ছুবার. বুঝলেন! আর ছুনিয়ার পানে চেয়ে দেখবেন, বিল ইনভয়েস ষ্টক-এক্সচেঞ্জ থেকে মনকে টেনে আনতে হবে···নাহলে স্বাস্থ্যের পক্ষে সুবিধা হবে না! ভিড় আর হট্টগোল ছেড়ে বাইরে একটু আসা চাই,···ফাঁকায়—কাজের ঝামেলা ছেড়ে। নাহলে টাকার ঝন্ঝনানি কানে আর শুনতে হবে না। মানে, ফার্ষ্ট ওয়ার্ণিং···বিছানায় পড়ে থাকবেন, শেয়ার-মার্কেটে বেরুতে পারবেন না।

বোঝা গেল, মাড়োয়ারি মক্কেল। বুকের মধ্যে চকিতের জন্য একটা চিন্তা··কাঁটার মতো খচ্ করে' উঠলো। মনে হলো, পায়রার মতো উড়ে বেড়াচ্ছি···বাপের পয়সা শুধু খরচই হচ্ছে···আমানতের অঙ্ক প্রায় শূন্য! আর এ-লোকটা মিনিটে মিনিটে কি-টাকাই না রোজগার করছে! গরীবের ছেলে··পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকতো···

মাড়োয়ারি এলো চেম্বার থেকে বেরিয়ে···পিছনে মহিম। মহিমের চোখ পড়লো তরফদারের উপর···বললে—খবর কি?

তরফদার বললে—সন্ধ্যার সিনেমা-শোতে আপনার কম্প্যা[illegible]বার সৌভাগ্য হবে আমাদের?

মৃদু হাস্যে মৃদু কণ্ঠে মহিম বললে—সময় কোথায় মিষ্টার তরফদার? সাফারিং হিউমানিটি! মনে হয়, চব্বিশ ঘণ্টার বদলে আটচল্লিশ ঘণ্টায় দিন হতো, আমার আরো শক্তি থাকতো, তাহলে কিছু করা হয়তো সম্ভব ছিল টু ব্রিং হেল্থ্ টু অল্!

কথাটা তরফদারের ভালো লাগলো না! ইস্, মস্ত মহাত্মা যেন! রোগীদের বেদনাতে গলে আছেন! টাকা পিটছো কি রকম, বাপু!

এ কথার খানিকটা মুখ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে পড়লো তবে মোলায়েম সুরে মসৃণ ভাষায়। তরফদার বললে—টাকা পিটছেন তো অজস্র।

মহিম বললে—টাকা আসছে বৈ কি। তবে ওর মধ্যে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়। সকলকে দেখবো, তার সময় কৈ? কাজেই একটা দামের বেড়া খাড়া রাখতে হয়েছে। তবু মানুষ বুঝে সে-বেড়া টপকাই নিশ্চয়। এই যে শেঠজী··পঞ্চাশ হাজার টাকা ইনকাম্-ট্যাক্স দেন। তাহলে ভাবুন কত টাকা আয়। ওঁর কাছে থেকে একশো টাকা নিই বলে' কি গরীবের কাছ থেকেও তা নিতে পারি···এর-মধ্যে একঘণ্টা বিনা মূল্যে ব্যবস্থা আছে মিষ্টার তরফদার।

তরফদার একটু অপ্রতিভ হলো, বললে—আমাদের আজকের প্রোগ্রামের ফার্ষ্ট পাট সারা হলো মার্কেটিং···লাঞ্চ, তারপর রিভার ট্রিপ কিন্তু আপনি ছিলেন না··শিব-হীন যজ্ঞ যেন। মিসেস রয় মুসড়ে ছিলেন আপনাকে না পেয়ে। আবার সন্ধ্যায় চলেছি সিনেমা—তাই উনি জিজ্ঞাসা করলেন, সন্ধ্যার এ শোতে আপনাকে যদি···

—না, না, আমায় আপনারা ক্ষমা করবেন। আনন্দ-উৎসবে যোগ দেবার সৌভাগ্য নিয়ে আমি জন্মাতে পারিনি মিষ্টার তরফদার।

হুঁ! বর্ব্বরের কাছ থেকে এমনি প্রত্যাশাই সে করেছিল! তবু মিসেস রয়ের উপর মমতা প্রকাশ করতে! কোনোমতে সপ্রতিভ ভাব দেখিয়ে তরফদার বললে,—তাহলে আর উপায় কি! তবে রোগীকে যে পরামর্শ দিচ্ছিলেন, মাঝে মাঝে দুনিয়ার পানে চাইতে হয় একটু আধটু। আপনিও···

হেসে মহিম বললে—জানেন তো আমরা পরকে যে-সব উপদেশ দিই, নিজেরা তা কখনো করিনা··সে সব কাজ ষ্টুডিয়স্‌লি এ্যাভয়েড করি! দিস ইজ্ সিভিলিজেশন্!···হা হা হা! এই দেখুন না এখন পাঁচটা ···সাড়ে পাঁচটায় যাবো মাণিকতলা···সিরিয়েস কেশ।

তরফদার বললে—বটে! তাবলে রাত্রে ফাঁকি দিতে পারবেন না। আপনরে এখানেই আজ আমরা ডিনার খাচ্ছি।

তরফদার চলে এলো। মহিম ঢুকলো চেম্বারে। তারপর দু-চারটে যন্ত্রপাতি নিয়ে তখনি বেরুলো মাণিকতলার রোগীর উদ্দেশে।

তরফদার এলো দোতলার পার্লরে···ললিতা তখনো সেখানে—তরফদারের পানে চেয়ে বলে উঠলো—এ কি চেহারা···যেন বেত খেয়ে এসেছেন!

অপ্রতিভ হাস্যে তরফদার বললে,—যা বলেছেন! বেত নয়··· জুতো!

ইভা বললে—তার মানে?—

—উনি এখনি কেশ দেখতে বেরুচ্ছেন···মাণিকতলা। বললেন, সাফারিং হিউম্যানিটি···এক-তিল অবসর নেই আমাদের সঙ্গে আমোদ করবেন!

—হুঁ! ললিতা বললে—গলা বাড়িয়ে চড় খেতে গেছলেন যেমন! ওয়েল নেভার মাইণ্ড, আমাদেরও অবসর নেই। এখনি তৈরি হয়ে নেবো। আয় রেবা, তোরা কে মুখ হাত ধুবি, চট্ করে নে··· বয়কে আমি বলেছি, চা আনতে।

মাণিকতলার রোগী দেখে মহিম ফিরছিল···রাত প্রায় নটা··· হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠলো···মহিম ভাবছিল রোগীর কথা···সাইরেনের আওয়াজে চিন্তার সূত্র গেল ফেঁশে। উৎকর্ণ হয়ে রইলো এক সেকেণ্ড··· তারপর ড্রাইভারকে চীৎকার করে বললে - সাইরেন!

ড্রাইভার বললে,—জী···

—গাড়ী রাখো। কিনারা করো···এখনি। তারপরে দেখি কোনো সেলটার।

ড্রাইভার গাড়ী রাখলো ফুটপাথের গা ঘেঁষে। মহিম বললে—গাড়ী থেকে নেমে এসো···গাড়ীতে নয় সেলটার।

ভীত ত্রস্ত পথিকদের কি সে আর্ত্ত চাঞ্চল্য! পাগলের মতো মানুষ ছুটেছে! ছুটতে কেউ পড়ে যাচ্ছে···কেউ তাকে মাড়িয়ে ডিঙ্গিয়ে চলেছে···

সামনে বস্তী। বস্তীতে সামনেই বড় এক দোতলা মাঠকোঠা। লোকজন ছুটে সেখানে গিয়ে ঢুকছে আশ্রয়ের জন্য···ড্রাইভারকে নিয়ে মহিম সেই ঘরে ঢুকলো।

ঘরে ভিড়। লোকের পর লোক আসছে···বন্যার জলোচ্ছ্বাসের মতো! ···ছেলে বুড়ো জোয়ান···মেয়ে পুরুষ, ধনী গরীব···বিপদের বিষাণ সকলকে এক করে' দেছে·· মর্য্যাদার প্রতিপত্তির সব প্রাচীর ভেঙ্গে চূর্ণ করে'।

মহিম এসে তাদের সঙ্গে মিশে দাঁড়ালো।

ভিড়ের মধ্য থেকে উঠছে···বহু কণ্ঠ থেকে অদ্ভুত মিশ্র গুঞ্জন··· সে গুঞ্জনে আতঙ্ক···ভয়···বিস্ময়···কোনোটার অভাব ছিল না!···বিচিত্র গুঞ্জন মহিমের কাণে বাজছিল।

—ভাগ্যে এ আশ্রয়টুকু ছিল···প্রাণটা যদি বাঁচে!

—কি ভয়ানক কাণ্ড···এ্যাঁ···

—বাড়ীতে কে কি করছে···ছেলেগুলো কোথায় রইলো···

—বোমা পড়ে যদি বাড়ীর ছাদে?

—হে ভগবান রক্ষা করো! জয় মা-কালী—জয় বাবা বিশ্বনাথ—জয় মা তারা—ওমা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী···

মস্ত হল-ঘর···ঘরের দরজা কে বন্ধ করে' দেছে ভিতর থেকে। ওদিক থেকে দোরে ঘা পড়লো···সেই সঙ্গে কণ্ঠ,—খোলো, খোলো—শীগগির দরজা খোলো···

কে একজন দরজা খুললো···এক জোয়ান ভদ্রলোক ঢুকলেন এক অন্ধ

ভিখারীর হাত ধরে। অন্ধকে ঘরে রেখে জোয়ান ভদ্রলোক বললেন—ভয় নেই কিছু··· এখানে নিরাপদ···

আর্ত্ত কণ্ঠে অন্ধ বললে,—কিন্তু আমার ঘরে আমার স্ত্রীর খুব অসুখ··· ছেলেমেয়েগুলো···

ভদ্রলোক বললেন—আমি যাচ্ছি···সব দেখছি। এটা আমাদের পার্টি-অফিস···আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

অন্ধকে রেখে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন।

ভিতরে কে চেঁচিয়ে উঠলো—সাইরেন থেমেছে···

সঙ্গে সঙ্গে বহু আর্ত্ত কণ্ঠ,—এলো তাহলে···ঐ···ঐ···ঐ! শুনতে পাচ্ছো···বোমা···বোমা···ঐ ঘর্ঘর শব্দ!

সঙ্গে সঙ্গে একজন স্ত্রীলোকের চীৎকার—ওমা···অজ্ঞান···অজ্ঞান হয়ে গেছে বামার পিসি! জল···জল···জল!

এক কিশোরী এলো সামনে···বললে—শুইয়ে দাও, শুইয়ে দাও—ভিড় ছাড়ো···বাতাস করো, আমি ছুটে গিয়ে জল আনি।

কিশোরী দাঁড়ালো না, তখনি বেরিয়ে গেল।

ভিড়ে আতঙ্ক আরো নিবিড় হয়ে উঠলো···মহিম শুনলো এ-চীৎকার।

এগিয়ে এলো। বললে—আমায় একটু দেখতে দিন। আমি ডাক্তার।

ডাক্তার! আঃ! বিপদে একমাত্র কাণ্ডারী! ভিড় তখনি সরে সরে পথ করে দিলে···মহিম এসে দেখলো।

পকেটে ছিল স্মেলিং-শল্টের শিশি·· মূর্চ্ছিতার নাসায় ধরবামাত্র সে ধড়মড় করে' উঠলো।

মহিম বললে—চোখ চেয়েছেন! আপনারা ভিড় করবেন না।

ভিড় আশ্বস্ত হলো, আঃ খুব বেঁচে গেছে।

ওধারে অল-ক্লীয়ার-সাইরেন···

সকলের হর্ষ-ধ্বনি—চলো হে চলো, বোমা ভেগে গেছে!

মূর্চ্ছিতা বললে—আমি···আমি···

মহিম বললে—আপনি ভালো আছেন। বোমার ভয় আর নেই। একটু পরে আপনি বাড়ী যাবেন।

ঠেলাঠেলি করে ভিড় সরে যাচ্ছিল···কিশোরী ফিরলো। তার হাতে বড় ঘটিতে জল···এসেই মূর্চ্ছিতার মুখে কিশোরী জলের ছিটা দিলে।

সে বললে—দিদিমণি···

—হ্যাঁ।

—একটু জল খাবো।

—খাও।

কিশোরী তার মুখে জল দিলে···বামার পিসি জল খেলো।

তারপর কিশোরী চাইলো মহিমের পানে···দেখে চমকে উঠলো! তার পানে চেয়ে মহিম নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল।

এগিয়ে এসে কিশোরী বললে—খুব অবাক হয়েছো মহিমদা···না? এতদিন পরে শিবানী হঠাৎ···

নিশ্বাস ফেলে মহিম বললে—হ্যাঁ। এভাবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে···

—স্বপ্নেও তুমি ভাবোনি···না?

—না।

কিশোরী শিবানী। শিবানী বললে—এইখানেই আমি থাকি···এই আমার আশ্রয়।

—কিন্তু এ আশ্রয়···

—সে সুদীর্ঘ ইতিহাস মহিমদা। কিন্তু সে সব কথায় আর কাজ কি আজ!

গম্ভীর কণ্ঠে মহিম বললে—কাজ আছে শিবানী। একদিন ভুল বুঝে আমাকে তুমি অপরাধী মনে করেছিলে! আবার যখন দেখা হলো, তখন···

শিবানী চাইলো নত মুখে মেঝের পানে, বললে—তাতে লাভ ?

—লাভ আছে। হয়তো তাহলে এই ভুল আর সংশয়ের কুয়াশা কাটিয়ে দুজনের মন আবার স্বচ্ছ নির্ম্মল হতে পারবে।

শিবানী নিরুত্তর। মহিম ডাকলো—শিবানী···

নিশ্বাস ফেলে শিবানী বললে—বেশ···তাহলে উপরে এসো···আমার ঘরে।

দুজনে এলো উপরে·· শিবানীর ঘরে।

পরিচ্ছন্ন ঘর। খোলা জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসেছে ঘরে। একদিকে একানে একখানি নেয়ারের খাটিয়া···খাটিয়ায় [illegible], তার উপর একখানা কম্বল···কম্বলের উপর ফর্শা একখানা চাদর আর একটা মাথার বালিশ। শিবানীর শয্যা। কোণে দড়ি-খাটানো আলনা—আলনায় ভাঁজ-করা দুখানি শাড়ী ঝুলছে···দু-তিনটে সায়া-সেমিজ··· আর দুটো ফুল-হাতা ব্লাউশ। মেঝেয় চারখানা ইটের উপর বসানো একটা কাঠের সিন্দুক। ওধারে আম-কাঠের একটা চারপায়া টেবিল··· টেবিলের সামনে একখানা টিনের চেয়ার···তার পাশে কোণ ঘেঁষে একটা হারিকেন আলো···একটা ষ্টোভ···একটা টিনের কেটলি আর চায়ের দুটো পেয়ালা আর পিরীচ। দেওয়ালে ক'খানা ছবি · বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধি, রবীন্দ্রনাথ, লাজপত রায়, তিলকের ছ

শিবানী বললে—এই আমার ঘর মহিমদা···

মহিম চারিদিকে ফিরে ফিরে দেখতে লাগলো। একখানা মোড়া ছিল খাটিয়ার পিছনে। সেখানা এনে শিবানী বললে—বসো···

মহিম বসলো···শিবানী জ্বাললো হারিকেন্। তারপর টেবিলের উপর হারিকেন তুলে পলতেটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে শিবানী তাকালো মহিমের দিকে, বললে—কি ভাবছো ?

একটা উদ্গত নিশ্বাস মহিম রোধ করতে পরলো না…নিশ্বাস ফেলে বললে—ভাবছি, বারো বছর পরে…

শিবানী যেন কাঠ!

মহিম বললে—এই বারো বছরে কি হয়ে গেল শিবানী…কত পরিবর্ত্তন!

শিবানী শুধু শুনলো…কোনো জবাব দিলে না…সে যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন!

মহিম বললে—ভাবছি…বারো বছর আগে সেই একটি রাত…বুড়ো শিবের মন্দির…সেই প্রদীপের আলো…আমাদের অনির্বাণ শিখা!

শিবানী যেন স্বপ্ন দেখছে! মুখে কথা নেই! চোখের সামনে ভেসে উঠলো ছায়ার মতো গ্রামের পথ-ঘাট…সেই ছোট বাঁকা নদী…পীতাম্বর জেলের চালা…বুড়ো শিবের মন্দির…প্রদীপের শিখা!

মহিম বললে—তারপর সেই ঝড়-জল-দুর্য্যোগ! সে দুর্য্যোগে কোথায় যেন তুমি মিলিয়ে গেলে…গাছের ঝরা পাতার মতো! কত খুঁজেছি… কত সন্ধান করেছি! এতটুকু চিহ্ন কোথাও পাইনি তোমার।

মহিম থামলো। শিবানীর বুকের মধ্যে হঠাৎ জেগে উঠলো সেই ঝড়ের গর্জ্জন! মহিম বললে—এমন করে' তোমার নিরুদ্দেশ হওয়া…আমার কাছে আজও গভীর রহস্য রয়ে গেছে শিবানী!

শিবানী ফিরলো যেন স্বপ্নলোক থেকে সত্যকার জগতে। একটা নিশ্বাস ফেলে বললে—কিন্তু সে-রাত্রে সরে আসা ছাড়া আমার আর অন্য উপায় ছিল না মহিমদা!…তোমার বাবার জীবনে একটি মাত্র স্বপ্ন…ভালো কথা, কাকাবাবু কেমন আছেন? এখন কোথায়? কাকিমা?

মহিম বললে—তাঁরা আজ আট বছর হলো, মারা গেছেন।

তারপর নিমেষের স্তব্ধতা···সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে মহিম বললে—কিন্তু বাবার সে স্বপ্ন আমি সফল করেছি শিবানী···ছেলের কর্ত্তব্য পালন করেছি !···মোদ্দা তুমি···

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শিবানী চাইলো মহিমের পানে।

আঁচল দিয়ে আঙুল জড়াতে জড়াতে শিবানী বললে—নিজেকে বাঁচাবার জন্য গ্রামের সেই একমাত্র আশ্রয় ছেড়ে আমি চলে এসেছি··· পথে। এই পথই আমার সব।

মহিম বললে—পথ !

—হ্যাঁ। ঘরের ছোট্ট জানলা দিয়ে চিরদিন একটুখানি আকাশ দেখতুম ···পথে এসে আজ দেখছি, ও-আকাশ অনেক বড়।

মহিমের চোখে শ্লেষ ! মহিম বললে—কিন্তু এ পথের সন্ধান তুমি পেলে কোথায় ?

—এ পথের সন্ধান দেছে আমায় রাজেনদা···আমার গুরু···আমার বন্ধু··· সহায়।

—রাজেনদা !···মহিম চমকে উঠলো ! বললে—আমাদের চণ্ডী-তলার রাজেন···হারু জ্যাঠার ছেলে ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু সে তো টেররিষ্ট-মুভমেণ্টে জেলে গিয়েছিল···ষোল বছর আগে তার জেল হয়।

—হ্যাঁ। জেল থেকে রাজেনদা পালিয়ে আসে। বলে, ভেবে দেখলুম, জেলে বসে থাকলে সময় নষ্ট হয়···কাজ পণ্ড হয়···তাছাড়া দুচারটে সাহেবকে গুলি করে' মারলে দেশকে স্বাধীন করা যাবে না তো ! তাই জেল থেকে পালিয়ে আসে। এসে যত গরীব-দুঃখীদের নিয়ে আছে। তারা যাতে লেখা-পড়া শেখে···নেশা-ভাং ছেড়ে মানুষের মতো বাস করে···রোগে ওষুধ পায়, পথ্য পায়, এই দেখা তার কাজ।

তার সে-কাজে রাজেনদা আমাকে সঙ্গে নেছে। এই বস্তী দেখছো, এই বস্তীতে···

—হুঁ···কিন্তু তার নামে পরোয়ানা আছে নিশ্চয়! জেল-ফেরত আসামী···তাও আবার স্বদেশীর আসামী।

—হুঁ। রাজেনদাকে কেউ তো চেনে না। তাছাড়া নিজেকে সাবধানে বাঁচিয়ে চলতে জানে রাজেনদা।

মহিম কি ভাবলো! তারপর বললে—কিন্তু রাজেনের সঙ্গে তোমার দেখা হলো কি করে'?

শিবানী তখন খুলে বললো সব কথা···মহিমকে সে মিথ্যা-ভাষে বিদায় দিয়ে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেনি···তখনি ছুটে গিয়েছিল মহিমের পিছনে···তারপর উঠলো সেই ঝড়···কোথায় যাবে? আশ্রয় কোথায়? নকুল আর খুড়িমা দুজনের ভয়ে দিশাহারা সে ছুটে এসে পড়ে বুড়ো শিবের মন্দিরে ঠাকুরের পায়ে। সেইখানে দেখা রাজেনদার সঙ্গে। রাজেনদা চণ্ডীতলায় এসেছিল তার পিসিমার সঙ্গে দেখা করতে···তারপর বনের পথ ধরে চুপিচুপি চলে আসছিল··· দুর্যোগে নিয়েছিল মন্দিরের মধ্যে আশ্রয়···শিবানী তার কাছে কেঁদে বলে—বাঁচবার ব্যবস্থা করে দিতে পারো রাজেনদা?···রাজেনদা তখন···

সেই অবধি শিবানী আছে রাজেনের সঙ্গে···বন্যায় মহামারীতে রাজেনদা যেখানে যখন ছুটে গেছে, শিবানী গেছে সঙ্গে সঙ্গে···এ কাজ করে সে বাঁচতে পেরেছে। নাহলে···

হুঁ! একদৃষ্টে শিবানীর পানে তাকিয়ে মহিম শুনলো দীর্ঘ কাহিনী! মনের মধ্যে একটা সংশয় সাপের মতো ফণা তুলছিল! শিবানী কি···

ঘরে যেটুকু আলো ছিল, সে আলোয় শিবানী না জানতে পেরে,

সতর্ক দৃষ্টিতে সন্ধান করলো···শিবানীর সীমন্তে! না, সিন্দুরের বিন্দুও নেই। মণি-বন্ধে দুগাছি করে' কাচের চুড়ি···লোহা নেই!···

শিবানী বললে,—আমার কথা তো শুনলে, এখন তোমার কথা বলো মহিমদা। বৌ নিশ্চয় ভালো হয়েছে···

মহিম বললে—হ্যাঁ।

—তোমার কত পশার···কত নাম···লোকের মুখে শুনি। কত-দিন মনে হয়েছে বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি···চোখে একবার যদি তোমাকে দেখতে পাই! যাইনি···ভয় করে!···

—ভয়!

—বড়লোক হয়েছো তুমি···মানী মানুষ···

—বড় মানে, বর্ব্বর হয়েছি তাহলে? অর্থাৎ ছোট হয়ে গেছি··· তোমার ধারণা?

—তা নয় মহিমদা···শুনি, অনেক টাকা তোমার ফী। তাই ভয়! তুমি বলতে, গরীব-দুঃখীদের দেখবে···গরীব-দুঃখীর ডাক্তার হবে··· গ্রামে গিয়ে বসবে।

মহিম বললে—পুরোনো কথা ক-জন রাখে শিবানী? তু[illegible]···

অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্য শিবানী বললে—যাক [illegible] কথা ···ছেলেমেয়ে?

—একটি ছেলে।

—কত-বড় হলো?

—পাঁচ বছর।

শিবানী চুপ করে রইলো···মহিম বললে—আসি শিবানী, অনেক রাত হয়েছে।

শিবানী বললে—বসবে না একটু? সত্যি, শুনে বড্ড দেখতে ইচ্ছা করছে···আনবে একদিন মহিমদা, বৌদিকে? তোমার বাচ্ছাকে?

—দেখবো। আজ আর বসবো না···আর একদিন আসবো'খন। আজ আবার আমাদের বিয়ের তারিখ কি না···বাড়ীতে ক'জন অতিথি···

কথাটা বলে মহিম হাসলো···তাচ্ছল্যের হাসি।

শিবানী কিন্তু চঞ্চল হয়ে উঠলো, বললে—ও···তাই না কি?··· তাহলে একটু দাঁড়াও···

বলে' শিবানী গিয়ে কাঠের সিন্দুক খুললো। তার-মধ্যে রাজ্যের জিনিষ। সিন্দুক থেকে চামড়ার তৈরী একটা ভ্যানিটি-ব্যাগ বার করে এনে মহিমের সামনে ধরলো···বললে—আজকের দিনে সামান্য উপহার, বৌদির জন্য···নিয়ে যাবে? আমার নিজের হাতে তৈরী।

মৃদু হাস্যে মহিম বললে—নিশ্চয় নিয়ে যাবো।

মহিম ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, পিছনে শিবানী। দুজনে এলো একতলার হল-ঘরে। মহিম বললে—আসি তাহলে···

শিবানী বললে,—এসো···তারপর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে—কালই আনতে পারো না মহিমদা, বৌদিকে আর খোকনকে?

—কাল! মহিম বললে—দেখবো!

মহিম পথে এলো।

শিবানী দাঁড়িয়ে রইলো ঘরে···মলিন ম্লান মুখ!···

পথে গাড়ীতে উঠবে, রাজেনের সঙ্গে দেখা। মহিম ডাকলো—রাজেন···

—ও মহিম! শিবানীর সঙ্গে দেখা হলো?

—হ্যাঁ···একেবারে কল্পনাতীত ভাবে।

—বটে!

দুজনে কথা হলো···অনেক কথা···দেশের কথা···গরীব-দুঃখীর কথা···রাজেনের নিজের কথা···শিবানীর কথা···এবং যখন এত কথার

মধ্যে মহিম শুনলো শিবানীর ধনুর্ভঙ্গ পণ—বিবাহ করবে না···দেশের আর দশের কাজে জীবন সমর্পণ করেছে···শিবানীর সাহস আর শক্তি আশ্চর্য্য···যেমন নরম মন, সে-মনে তেমনি শক্তি আর সংযম···আঃ!

গাড়ীতে বসলো মহিম···প্রশান্ত প্রসন্ন মন নিয়ে। সাপের মতো যে সংশয় মনকে বিষিয়ে তোলবার উদ্যোগ করছিল, সে-সংশয় মন্ত্রাহতের মতো নির্জীব লুটিয়ে পড়লো!

৪

ঘড়িতে রাত বারোটা বাজলো। ললিতার ড্রয়িং রুমে অতিথির দল চঞ্চল হয়ে উঠলো···ডিনার চুকে গেছে অনেকক্ষণ···বিলাতী ডিনারের টাইম একেবারে বাঁধা। বিলাতী-চালের দেশী বাড়ীতে সে টাইম একেবারে পাঁজিতে লেখা লগ্নের মতো কাঁটায় কাঁটায় রক্ষা করা হয়। এ-বাড়ীতে সে-নিয়মের ব্যতিক্রমের এতটুকু চেষ্টা হয় নি··· আভা বলেছিল—বাজুক ভাই সাড়ে নটা···ডক্টর রায় ফিরুন।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে' ললিতাই প্রতিবাদ তুলেছিল—তিনি যদি ফেরেন রাত বারোটায়? তাঁর জন্য তাবলে' এতগুলো মানুষকে পীড়ন করা চলে না।

এ-কথার পর···

ঘড়িতে বারোটা বাজলো শুনে মিসেস পাকড়াশি বলে উঠলো —না ভাই আর বসা চলে না। বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছি সেই কোন্ বেলা নটায়!

কমলা বললে—সত্যি···সারাদিন কি হৈ-হৈ করে কাটলো!

মনোরমা বললে—সব ভালো হলো শুধু ডক্টর রয়ের জন্য আমোদটুকু ষোল কলায় পূর্ণ হলো না!

আভা বললে—আশ্চর্য্য মানুষ কিন্তু···ডিনারে নাই এলেন, তাবলে এই বোমার হাঙ্গাম গেল, একটা খবর তো দিতে হয়।

ললিতা ফোঁশ করে উঠলো—আমরা তো তাঁর রুগী নই যে আমাদের জন্য দুর্ভাবনা হবে!

তরফদার বললে—যা বলছেন ললিতা দেবী···আই পিটি ইউ! সাচ্ আনসিমপ্যাথেটিক হাসব্যাণ্ড!

সকলে উঠে পড়লো···গুড নাইট···গুড নাইট···

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে সকলে নামলো নীচে···ললিতাও সঙ্গে এলো, —পর্চ্চে ওদিকে গাড়ী ঢুকলো···আভা বলে উঠলো—এই যে ডক্টর রয়···ললিতা চোখ ফেরালো অন্য দিকে।

গাড়ী থেকে নেমে মহিম এলো ভিতরে···মিসেস পাকড়াশী বললে —তবু ভালো, দর্শন মিললো!

কৃতাঞ্জলি-পুটে মহিম বললে—ক্ষমা করবেন···নেহাৎ নিরুপায় আমি! পথে সাইরেন বাজলো···শেল্‌টার্ নিলুম···তারপর অল-ক্লীয়ার হতেই···এ-ত্রুটি আমার ইচ্ছাকৃত নয়···ক্ষমা চাইছি।

হেসে মনোরমা বলে উঠলো,—ক্ষমা চান গিয়ে ললিতার কাছে। বেচারী বাসর সাজিয়ে বসে...আপনার আশায় কতখানি নিরাশ হলো বলুন তো!

হাসি আর কথার ঝাপটার মধ্যে সকলের বিদায়।

সকলে চলে গেলে ললিতা উপরে উঠবে, মহিম বললে—খুব ভাবনা হয়েছিল তোমার···আমি বুঝি···

ললিতা জবাব দিলে না···দু-তিনটে সিঁড়ি অতিক্রম করলো।

মহিম বললে,—তুমি রাগ করেছো···তোমার আজকের উৎসবে আমি একটিবার থাকতে পারলুম না!

ললিতা দাঁড়ালো মহিমের পানে চেয়ে···সঝঙ্কারে জবাব দিলে—রাগ আবার কিসের! আমি জানতুম, তুমি আসবে না।

—তুমি জানতে?

—নিশ্চয়। সকলের সামনে আমার উপর অবজ্ঞা দেখিয়ে আমাকে খাটো করবার এত-বড় সুযোগ ··এ তুমি ছাড়তে পারো না!

—এ কথার মানে?

—মানে, আজ আমাদের বিয়ের তারিখ···আর সেই তারিখ নিয়ে ওরা করেছে উৎসবের আয়োজন···সে-উৎসবে আমি আছি, তুমি নেই···মানুষের চোখে কতখানি এটা খারাপ দেখায়, তুমি তা বোঝোনা, বলতে চাও?

মহিম নিরুত্তর···

ললিতা বলতে লাগলো—ঘরে আমাকে যত অবজ্ঞাই করো, তা বলে' বাইরে পাঁচজনের সামনেও?···আমার একটা মান নেই? ইজ্জৎ নেই? এমনি করে' তোমার অপমান সয়ে আমায় বাঁচতে হবে?

মহিম বললে—অপমান!···কিন্তু তোমার সঙ্গে কি আমার অপমানের সম্পর্ক লিলি? তুমি আমার স্ত্রী···

আরো গলা চড়িয়ে ললিতা জবাব দিলে অত্যন্ত তাচ্ছল্যের ভঙ্গিতে—থাক, থাক···স্ত্রী! আমাকে তুমি বিয়ে করেছো শুধু আমার বাবার টাকার লোভে···সমাজে নিজের প্রতিষ্ঠা···নিজের পোজিশন গড়ে তোলবার জন্য!

মহিমের বিরক্তি হলো···সারাদিন খাটুনির পর স্ত্রীর কাছে কখনো একটা ভালো কথা শুনবে না?···তার উপর এত বড় অপমানের কথা! মহিম ডাকলো,—ললিতা···

কণ্ঠ একটু তীব্র!—ললিতা তাকালো মহিমের পানে।

নিজেকে সম্বৃত করে' মহিম বললে—তোমার বাবাকে আমি চিরদিন শ্রদ্ধা করেছি···আজও করি।···কিন্তু থাক, এ-কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে···এই পর্য্যন্ত বলে' ক্ষিপ্র চরণে মহিম উঠলো ললিতার পাশ দিয়ে সিঁড়ি বয়ে দোতলায়···ললিতা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো।

ল্যাণ্ডিং অতিক্রম করে' মহিম ঘরে ঢুকলো। ললিতা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না! কে যেন তাকে ধরে দুমড়ে মুচড়ে নুইয়ে দিলে! দুঃখ ক্ষোভ অভিমান বুকে এমন ঝড় তুললো যে সে-ঝড়ের ধাক্কায় ছুটে সে তখনি এলো ঘরে মহিমের কাছে···এসে আর্ত্ত কণ্ঠে বলে উঠলো—তুমি···তুমি কি আমাকে কখনো বুঝবে না? কোনো দিনই নয়?

গলার টাই খুলতে খুলতে ললিতার পানে না চেয়েই মহিম জবাব দিলে—তোমায় আমি বুঝি ললিতা!

—তবে·· কেন তবে এমন অবহেলা করো?

মহিম ফিরলো ললিতার দিকে, বললে—কবে তোমার অবহেলা করেছি, বলো?

ললিতা মহিমের বুকের উপর লুটিয়ে পড়লো···অভিমান-ভরা কণ্ঠে বললে—আজ কেন তুমি এমন করলে? কেন এলে না তুমি?

মহিম বললে—উপায় ছিল না লিলি। ইচ্ছা থাকলেও কাজের ভিড়ে সময় করতে পারিনি। তাছাড়া ফেরবার পথে সাইরেন বাজলে একটা বস্তীর ঘরে সেলটার নিয়েছিলুম—সেখানে হঠাৎ দেখা শিবানীর সঙ্গে···যার কথা তোমায় বহুবার বলেছি···

—শিবানী! মহিমকে ছেড়ে সরে এলো ললিতা ··· বললে—বস্তীতে শিবানী!

—হ্যাঁ! গরীব-দুঃখী অন্ধ-আতুরদের সঙ্গে বাস করছে···তাদের

দুঃখ দূর করা, রোগে সেবা, লেখাপড়া কাজকর্ম্ম শেখানো··· এমনি নানা ভালো কাজ নিয়ে সে আছে, শুনলুম। চোখেও দেখলুম। বারো বছর পরে দেখা···দু-একটা কথা না কয়ে আসা যায় না লিলি···

ললিতার মুখে কথা নেই! মনে প্রধূমিত বহ্নি···তার শিখা দু'চোখে জ্বল্‌জ্বল্ করে' উঠলো।

মহিম বললে—ভালো কথা, আজ আমাদের বিয়ের তারিখ শুনে তোমাকে উপহার দেছে···

বলে ভ্যানিটি-ব্যাগটা ললিতার হাতে তুলে দিলে। ললিতা নিলে, নিয়ে বললে—ও···তার সঙ্গে এত প্রাণের কথা হয়েছে! বিয়ের তারিখের কথাও···তাহলে সময়ে কি করে আসবে? সত্যি···

মহিমের ভালো লাগলো না এ-কথা। মহিম বললে—কি করবো বলো? মানুষের সঙ্গে দেখা হলে কথা না কয়ে চলে আসবার মতো ভদ্রতা তো শিখিনি! হ্যাঁ, শিবানী অনেক করে' বললে···তোমাদের নিয়ে কাল তার ওখানে যেতে···তোমায় আর খোকনকে নিয়ে···

—যেতে আমার বয়ে গেছে! যাচ্ছি আমি! খোকনকেও যেতে দেবো না! কী আমার পরমাত্মীয়!···আমি যাবো না।

—যেয়োনা! বলে মহিম পাশের ঘরে চলে যাচ্ছিল···ললিতা স্থির-স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে রইলো···রাগে তার দুচোখ জ্বলে উঠলো—ভ্যানিটি-ব্যাগটা অবজ্ঞা-ভরে ছুড়ে ফেলে দিলে মেঝেয়···

মহিম ফিরে দেখলো; ধীরে ধীরে এসে ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে ললিতার পানে তীক্ষ্ণ একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পাশেই নিজের শয়ন-ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

পরের দিন···

স্বামী-স্ত্রী···নিত্যকার মতো দুজনের জীবন-ধারা···রোগী আর কলেজ নিয়ে স্বামী রইলো···স্ত্রী তার প্রসাধন, বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে হাসি-গল্প···দাসী-চাকর-ঠাকুরদের উপর শাসন-ভাষণ···

সন্ধ্যার সময় রোগী দেখতে বেরিয়ে মহিম ঘড়ি খুলে দেখলো··· একটু অবসর আছে। শিবানী আশা করে' বসে থাকবে, তাকে সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন যে তার বৌদি আর খোকনের আসা হলো না। বেচারী নাহলে···

বস্তির হল-ঘরে প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসর বসে। সে আসরে এ বস্তীর এবং কাছাকাছি অন্য বস্তীর অনেকে আসে, শিবানী তাদের অনেক কথা বলে। তাদের বোঝায়, তারাও মানুষ···ছোট কাজ করে বলে' তারা মানুষ-হিসাবে কারো চেয়ে ছোট বা খাটো নয়। যিনি জজ, তিনি তার বিদ্যা-বুদ্ধি নিয়ে যেমন আদলতে বসে বিচার-কাজ করেন, তারাও তেমনি···নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধি শক্তি নিয়ে কেউ গড়ছে মোটর-গাড়ী··কেউ তৈরী করছে বাড়ী-ঘর···কেউ বা গাড়ী হাঁকাচ্ছে···কেউ চাষ-বাস করছে···তাদের উপর বড় লোকদের, শুধু বড়লোকদের কেন, সমাজের কতখানি নির্ভর! জজ উকিল না হলেও যদি বা পৃথিবী চলে, কারিগর চাষা, এদের না হলে পৃথিবী অচল হবে! বোঝায়, তোমাদের অনেক দুঃখ, অনেক অভাব···কিন্তু তা নিয়ে বুক চাপড়ে কাঁদলে তো ভগবান নেমে এসে দুঃখ-অভাব ঘোচাবেন না···দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করতে হবে নিজেদের চেষ্টায়···কাজে-কর্ম্মে শিক্ষায়-দীক্ষায় তোমাদের মানুষ হয়ে দাঁড়াতে হবে···

সন্ধ্যার এ আসর ভাঙ্গলো, সকলে চলে যাচ্ছে, এমন সময় মহিম এসে উপস্থিত।

শিবানী ছুটে এলো, বললে—বৌদি? খোকন?

মলিন মুখে মহিম বললে—তাদের আসা হলো না শি

—হলো না! শিবানীর বুকখানা যেন ভেঙ্গে গে[illegible] নিশ্বাস চেপে শিবানী চুপ করে রইলো···কি বলবে, ভাষা নেই যেন!

মহিম বললে—মনে তুমি খুব ব্যথা পেলে···আমি জানি। কিন্তু···

নিশ্বাস আর চেপে রাখা গেল না। নিশ্বাস ফেলে শিবানী বললে—সারাদিন আমি কতখানি প্রত্যাশা নিয়ে···

মুখে মলিন হাসি···মহিম বললে—মানুষের উপর এখনো তুমি প্রত্যাশা রাখো শিবানী!···প্রত্যাশা রাখলেই আঘাত পেতে হয়।

শিবানী নির্বাক···

এ নির্বাক ভাব কাটলো দশ-বারো বছর বয়সের একটি ছেলে কেঁদে এসে ডাকলো—পিসিমা···

শিবানী বললে—কে···বটু! কি রে, কাঁদছিস কেন? কি হয়েছে?

বটু বললে—মা···

—মার কি হয়েছে?

—মার হাত-পা ঠাণ্ডা যেন বরফ···অজ্ঞান হয়ে গেছে। তুমি এসো এখনি।

—বটে! বলে শিবানী চাইলো মহিমের পানে, বললে—পারবে একবার আসতে মহিমদা? বিষ্টু বাবু···অন্ধ বেচারী···তাঁর স্ত্রীর খুব অসুখ···এটি বিষ্টু বাবুর ছেলে বটু।

মহিম বললে—নিশ্চয় যাবো।

—চলো বটু···

মহিম আর শিবানী এলো বটুর সঙ্গে বিষ্ণু বাবুর বাড়ী।

বস্তীর মধ্যেই ঘর। এক-কামরা চালা···বটুর মা শুয়ে আছে মেঝেয় মলিন শয্যায়···দেহ যেন পাত্!

রোগীকে পরীক্ষা করে' মহিম উঠে দাঁড়ালো, শিবানীকে লক্ষ্য করে' বললে—অন্য কোনো উপসর্গ দেখছি না…সভ্য কোনো ভয় নেই…তবে বড্ড এনিমিক্।

ফাতর নিবেদনের কণ্ঠে শিবানী বললে—একে বাঁচাতে হবে মহিমদা। তুমি বিহিত করো। নাহলে এই তো দেখছো সংসার…স্বামী …অন্ধ…আর এই সব বাচ্ছা-কাচ্ছা…

মহিম চোখ বুলিয়ে দেখে নিলে। ঘরের এক কোণে একটা কেরোসিন কাঠের টেবিল…তার উপর একগাদা বই…খাতা। কাগজ নিয়ে প্রেসক্রপশন লিখে মহিম বললে—আমি গিয়ে ডিস-পেনসারি থেকে ওষুধ তৈরী করিয়ে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু শুধু ওষুধে হবে না, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে…

শয্যার প্রান্তে বসে ছিল বিষ্ণু বাবু…পথে গান গেয়ে ভিক্ষা করে' দু-পয়সা যা আনে, তাতেই সংসার চলে।

মহিমের কথা শুনে বিষ্ণু বাবু বললে—দুবেলা ভাত জোটে না ডাক্তার-সাহেব…খাওয়া-দাওয়ার কথা বলছেন আপনি!

মহিম বললে—সে-ব্যবস্থা শিবানী করবে'খন…আমি বলে দেবো।

এ কথা বলে মহিম তাকালো ঘরের চারিদিকে…দারিদ্র্য আর অভাবের এমন জমাট করুণ রূপ বড় চোখে পড়ে না! বইগুলোর দিকে দৃষ্টি পড়লো…ভালো ভালো বই। একখানা বই হাতে নিয়ে দেখলো। দেখে অবাক! মার্ক্সের বই।

সবিস্ময়ে মহিম প্রশ্ন করলো শিবানীকে লক্ষ্য করে'—এ সব কার বই এখানে?

শিবানী বললে,—বিষ্টু বাবুর।

—উনি পড়েন?

বিষ্ণু বাবু জবাব দিলে। বললে—পড়ি না···পড়তুম ডাক্তার সাহেব, যখন চোখ ছিল।

বিস্ময় এবং কৌতুহল-ভরা দৃষ্টিতে মহিম চেয়ে রইলো বিষ্ণুবাবুর পানে···নির্ব্বাক।

শিবানী বললে—আজই শুধু এই অবস্থা মহিমদা, দুদিন আগে উনি ছিলেন···গলির মোড়ে দেখেছো মস্ত ঐ ফ্যাক্টরি···উনি ছিলেন ঐ ফ্যাক্টরির ফোরম্যান।

মহিম বললে—ফোরম্যান!···হঠাৎ তাহলে?

মলিন হাস্যে বিষ্ণু বাবু বললে—হঠাৎই ডাক্তার সাহেব! এই হাত··· বলে' নিজের দুই হাত বিষ্ণু বাবু প্রসারিত করে ধরলো, ধরে বললে— আমার এই হাতেই ঐ কারখানার সৃষ্টি···একদিন। ক'বছর বা! সে দিনের কথা। রাস্তার গা ঘেঁষে একখানা টিনের চালা···দিনে দিনে সে চালা গড়ে উঠলো ঐ বিরাট কারখানা হয়ে। কাজ আসতে লাগলো ···বন্যার জলের মতো। আমাদের একদণ্ড নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ ছিল না। মনিবের ঘরে টাকার পাহাড় জমতে লাগলো···বাড়ীর পর বাড়ী···গাড়ীর পর গাড়ী···বিলাস আরাম ঐশ্বর্য্য···মান-সম্ভ্রম-মর্য্যাদা··· আর আমরা?··· বেচারী আমরা প্রাণ দিয়ে খাটি, পেট ভরে' দুমুঠো অন্ন আমাদের জোটে না! কত আবেদন জানিয়েছি, কত কাকুতি! কাণেও তোলেনি! নিরুপায়ে শেষে ধর্ম্মঘট করতে হলো। বিচার পেলুম না···মনিব গুণ্ডা লেলিয়ে দিলে। গুণ্ডার ভয়ে অনেকে গিয়ে আবার কাজে ঢুকলো। তাদের মতো আমি তা করতে পারিনি। পারিনি বলেই সকলে আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। আর আমার এই চোখের দৃষ্টি···গুণ্ডার হাতের এ্যাসিডে এ-দৃষ্টিটুকু জন্মের মতো হারিয়ে বসেছি! আমার পৃথিবী আজ অন্ধকার!

এই পর্য্যন্ত বলে বিষ্ণু বাবু চুপ করলো। ঘরের মধ্যে নিবিড়

স্তব্ধতা! মহিম এক-দৃষ্টে চেয়ে রইলো বিষ্ণু বাবুর দিকে…মনে হচ্ছিল, এমনি করে বড়র অবিচারে কত-জন আজ আর্ত্ত অসহায়…না খেতে পেয়ে প্রাণ হারাচ্ছে!

মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলে বিষ্ণু বাবু বললে—কিন্তু না, এ সব কথা আর কেন! ওরে বটু, চ'বাবা…আমাকে ঐ গলির মোড়ে রেখে আসবি—রাত বেশী হলে পথে আর কে চলবে…শেষে যে ভিক্ষে মিলবে না!

বাপের কথায় ছেলে বটু এসে বাপের হাত ধরে তাকে দাঁড় করালো। দাঁড়িয়ে বিষ্ণু বাবু বললে—আপনার অসীম অনুগ্রহ ডাক্তার সাহেব। মুখের কথায় কি-ধন্যবাদ জানাবো আপনাকে? মাথার উপর যিনি আছেন, তিনি আপনার মঙ্গল করবেন!

বটুর হাত ধরে বিষ্ণু বাবু ধীরে ধীরে চলে গেল।…

মহিম বললে—এসো শিবানী…এঁর ওষুধ আমি পাঠাবো, সেই সঙ্গে দু-চারটে টনিক দেবো…আর আজ থেকে এঁর চিকিৎসার ভার আমি নিলুম। বাঁচানো মানুষের হাত নয়, তবে আমার যতখানি চেষ্টা করা দরকার, সে-চেষ্টায় কোনো ত্রুটি হবে না, জেনো।

শিবানীর সঙ্গে মহিম বাইরে এলো।

বস্তীর গলি-পথ…এঁকে বেঁকে সদর রাস্তায় গেছে।

যেতে যেতে শিবানী দিতে লাগলো বস্তীর পরিচয় মহিমকে…বললে—যতই এদের দেখছি মহিমদা, জানছি এদের, ততই মনে হয়, এতগুলো মানুষ যে আমাদের অবহেলায় অবজ্ঞায় আজ হেজে পচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—কেউ এদের দেখবে না? শিক্ষা দীক্ষা ঐশ্বর্য্য নিয়ে ক'জন মাত্র শুধু পৃথিবীতে আনন্দ পাবে? আর এই এতগুলো প্রাণী…মুখ বুজে এরা চিরদিন পড়ে থাকবে এমনি পঙ্গু হয়ে সকলের পিছনে, অসহায় পশুর মতো?…আলোর এতটুকু রেখা এদের জীবনে কখনো ফুটবে না?

দুজনে এলো বস্তীর এক বাঁকে—একটা চ্যাঁচামেচি কানে গেল…

একটি স্ত্রীলোক চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো—সঙ্গে সঙ্গে [illegible] কদর্য্য গালাগালি।

শিবানী-মহিম উৎকর্ণ। শিবানী বললে—গোষ্ঠর বৌ। গোষ্ঠ মদ খেয়ে এসে আবার ঠ্যাঙাচ্ছে! দেখি একবার···

দেখবার জন্য বেশী এগুতে হলো না, আলুথালু বেশে একটি স্ত্রীলোক কেঁদে এসে লুটিয়ে পড়লো শিবানীর পায়ে···আর্ত্ত কণ্ঠে বললে—বাঁচাও গো দিদিমণি—জ্বলন্ত চ্যালা কাঠ নিয়ে মারতে আসছে···

চকিতে দৈত্যের মতো গোষ্ঠর আবির্ভাব! গোষ্ঠর হাতে একটা জ্বলন্ত কাঠ! গোষ্ঠ বলছিল,—তবে রে মাগী···টাকা দিবি নে? তোর বাবার রোজগারের টাকা···বটে!

শিবানী এগিয়ে গেল গোষ্ঠর সামনে, ডাকলো,—গোষ্ঠ···

শিবানী যেমন ডাকা···গোষ্ঠ একেবারে পাথরের পুতুল···স্থির নিশ্চল!

শিবানী বললে—ফ্যালো তোমার হাতের কাঠ।

মন্ত্র-চকিতের মতো গোষ্ঠ কাঠ ফেলে দিলে!

শিবানী বললে—বৌকে আবার ঠ্যাঙাচ্ছো তুমি?

—আজ্ঞে···আজ্ঞে···আজ্ঞে···

বৌয়ের দিকে চেয়ে শিবানী বললে—ভয় নেই হাবুর মা, ঘরে যাও। রাজেনদাকে বলে' আজই আমি এর বিহিত করবো।

—করো দিদিমণি, করো। নাহলে আমাকে ও জ্যান্তে পুড়িয়ে মারবে কোন্‌দিন।

দুজনকে দুদিকে বিদায় করে' শিবানী বললে—মহিমদা মানুষ কি অধঃপাতেই যাচ্ছে দিনে-দিনে! অথচ ঐ-গোষ্ঠ বৌকে ভালোবাসে। সেবার বৌয়ের অসুখে কেঁদে কেটে কি কাণ্ডই না করলে!···মদ খেলেই

ও জানোয়ার হয়ে ওঠে। নেশা কাটলে কাঁদে, দুঃখ করে! অথচ এ মদ কেন খায় বলতে পারো মহিমদা?

মহিম বললে—বোধ হয় নেশা করে' নেশায় মেতে ওরা ভুলতে চায় ওদের অসহ দুঃখ আর অভাব···এই খিদের জ্বালা···শ্রান্তি···অবসাদ··· সব কিছু!

নিশ্বাস ফেলে শিবানী বললে,—হয়তো তাই। কত বড় অভাগা এরা, ভাবো!···কিন্তু তোমায় অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি মহিমদা। আমারো কাজ আছে···কটি মেয়ে আসে চামড়ার ব্যাগ-ট্যাগ তৈরীর কাজ শিখতে। ঘণ্টাখানেক তাদের নিয়ে বসি···এ-সময় ছাড়া তারা অন্য সময়ে অবসর পায় না তো।

মহিম বললে—এসো, আমিও আসি। আমার ড্রাইভার তো জায়গা চিনে গেল...তাকে দিয়ে বিষ্টু বাবুর স্ত্রীর ওষুধটষুধগুলো এখনি আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—দিয়ো।

৫

ললিতার ড্রয়িং-রুমে ছোট্ট আসর। এ আসর নিত্য বসে। ললিতার বড় প্যাকার্ড গাড়ীতে চড়ে হাওয়া খাওয়া···কোনদিন বা ফ্রী সিনেমা দেখা ···তারপর ফিরে এসে এ আসরে চা, কফি, কোকো···কোল্ড ড্রিঙ্ক··· পেষ্ট্রি, প্যাটি, কেক···সেই সঙ্গে পর-চর্চ্চা···

আজকের আসর ছোট। পাকড়াশী তালুকদার নিত্য-অতিথি··· আরো কজন হাজির।

কোল্ড ড্রিঙ্ক সিপ্ করতে করতে মিসেস্ পাকড়াশী বললে—ভালো

কথা নয় লিলি···একেই তো তোদের দুজনের এই অবনিবনা···তার উপর আবার নতুন উপসর্গ বান্ধবী!

মিষ্টার তালুকদার তার ছুঁচোলো গোঁফটাকে মোচড়াতে মোচড়াতে বিজ্ঞের ভঙ্গীতে বললে—হুঁ···

ললিতা বললে—তোরা আমায় সবচেয়ে ভালো বাসিস বলেই কথাটা তোদের কাছে বললুম। তোরা ছাড়া কার সঙ্গেই বা এ সব কথার আলোচনা করি, বল্?

মাথা নেড়ে মিসেস পাকড়াশী বললে—তা তো বটেই···এ-কথা কি যাকে-তাকে বলা যায়? না, কেউ বলতে পারে?

তালুকদার বললে—তাই বটে, হুঁ, এখন মানে বুঝছি···

মিসেস পাকড়াশী বললে—কিসের মানে আবার?

তালুকদার একটা সিগারেট নিলে টিন থেকে···সিগারেট ধরিয়ে একটা টান দিয়ে বললে—বস্তীতে থাকে ঐ শিবানী, বললেন না? আজ এখানে আসবার সময় তাই দেখলুম বটে,···ডক্টর রয়ের গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে বস্তীর সামনে!

বাহিরে জুতোর শব্দ···সকলে সচকিত হলো···মহিম এলো ঘরে।

মিসেস পাকড়াশী তাড়াতাড়ি বললে—আপনার কথাই হচ্ছিল ডক্টর রয়, আর আপনি অমনি সশরীরে···

মৃদু হেসে মহিম বললে—বটে, টক্ অফ দী ডেভিল এ্যাণ্ড হী কাম্‌স্!

তালুকদার বলে উঠলো অপ্রতিভ ভাবে,—হেঁ হেঁ তা নয়, মানে, বলছিলুম যুদ্ধের দৌলতে বস্তীওলারাও দেদার পয়সা কামাচ্ছে, না হলে ডক্টর রয়কে মোটা টাকা ফী দিয়ে বাড়ীতে ডাকে!···আপনার গাড়ী দেখলুম কি না বস্তীর সামনে···

মহিম বললে—কিন্তু এ-বস্তীটি আপনাদের কালো-বাজারের বস্তী নয়।

এখানে বেশীর ভাগ মানুষ তুমুঠো অন্নও পায় না রোজ, ডাক্তারের ফী দেবে কি ? তাছাড়া ডাক্তারের গতি প্রাসাদে-কুটীরে…সর্ব্বত্র।

ললিতা ফোঁশ করে উঠলো—বস্তীর হয়ে এত ওকালতি ! আশ্চর্য্য ! বস্তীর উপর আজ ভারী দরদ দেখছি,…এত তত্ব সংগ্রহ করেছো !

এ-কথার উত্তর না দিয়ে মহিম সেখান থেকে চলে গেল।

মহিম চলে যাবার পর তালুকদার ডাকলো মিসেস তালুকদারকে—শীলা…

শীলা বললে—হ্যাঁ, উঠছি এবার। বাড়ীতে আমার এক ননদ এসেছে…ভারী সেকেলে মানুষ…কুণোর একশেষ ! তাছাড়া ছোট মন সেকেলেদের মতো…বলবে, আমি এসেছি, আর তুমি হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছো বৌদি !

গুড-নাইটের পালা। তারপর ললিতা এলো মহিমের কাছে, বললে—একটা কথা…

মহিম বললে—বলো।

—তুমি আজ আবার সেই বস্তীতে গিয়েছিলে ? নিশ্চয় তোমার বান্ধবী শিবানীর কাছে ?

—হ্যাঁ, গিয়েছিলুম ! বেচারী আশা করে বসে থাকবে…তোমরা যাবে না, তাকে তাই বলতে গিয়েছিলুম।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে ললিতা ঝঙ্কার তুললো—এত দরদ !

শান্ত কণ্ঠে মহিম জবাব দিলে—দরদ নয়, ভদ্রতা।

আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়লো ! ললিতা বললে—ভদ্রতা ! আর কাল এখানে এক-বাড়ী লোক যখন তোমার পথ চেয়ে বসেছিল, তুমি সেখানে বান্ধবীর সঙ্গে কল-কূজন করছিলে, তখন আসতে পারবেনা জানিয়ে খবর দিয়ে ভদ্রতা রক্ষার কথা মনে হয়নি তো !

এ-কথার জবাব দিলে না মহিম, শুধু বিরক্তির দৃষ্টিতে তাকালো ললিতার পানে। ললিতার রাগ আরও বাড়লো। ললিতা বললে—আমাকে তুমি ভোলাতে পারবে না! আমি সব বুঝি…সব জানি।

মহিম চাইলো…ভ্রূ কুঞ্চিত…প্রশ্ন করলো—কি জানো তুমি? কি বোঝো?

দুচোখে আগুন…ললিতা গর্জ্জে উঠলো,—পুরোনো বান্ধবী…বারো বছর পরে আবার তার সঙ্গে দেখা…পলকের অদর্শন সহ্য হচ্ছে না, তাই চুপি-চুপি…

—ললিতা…মহিমের স্বরে তীক্ষ্ণ ঝাঁজ! মহিম বললে—এ সব কি বলছো তুমি! যাকে তুমি জানোনা, চেনো না…চোখেও যাকে খ্যাখোনি কখনো, তার সম্বন্ধে এই সব ইতর ইঙ্গিত…

মনের মধ্যে আগুন…দু'চোখের দৃষ্টিতে আর কণ্ঠে সে-আগুন ভরে ললিতা বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমায় তুমি যত অবজ্ঞা করো, যত তুচ্ছ করো, তাবলে বান্ধবীকে নিয়ে তোমার এই নির্লজ্জ অভিসার অ… …ই নিয়ে পাঁচজনে এসে শ্লেষে অনুকম্পায় আমাকে বিঁধবে…এ আমি … সহ্য করবো না। No…never!

মহিম ডাকলো তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে,—ললিতা…

—এর আবার ললিতা কি! স্পষ্ট কথা বলতে কাকে… …মি কোনোদিন ভয় করিনি। তোমাকেও আমি স্পষ্ট করে বলছি, … সম্বন্ধে বোঝাপড়া করতে চাই আমি, আজই এখনি…

মহিম চেয়ে রইলো ললিতার পানে…স্তম্ভিত নির্বাক…নিরুপায় মূর্ত্তি!

ললিতা বলতে লাগলো,—ইস্! ইতর ইঙ্গিত তাঁর সম্বন্ধে ইঙ্গিতটুকুও সহ্য হয় না তোমার…আর আমাকে সহ্য করতে হবে তোমার এই ইতর আচরণ…যে-হেতু আমি তোমার স্ত্রী! কিন্তু জেনে রেখো, স্ত্রী হলেও আমি তোমার ক্রীতদাসী নই যে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে থাকবো

…মুখ বুজে সহ্য করবো তোমার এই অনাচার…অত্যাচার…অবজ্ঞা…অপমান !

রাগে ললিতার সর্বশরীর কাঁপছে…বাতাসের দোলায় গাছের পাতা যেমন কাঁপে, তেমনি !

মহিম কোনো জবাব দিলে না।…সঙ্গীন ক্ষণ ! এবং এ সঙ্গীন্ ক্ষণে ওদিক থেকে খোকনের কণ্ঠ ফুটলো—না, না, আমায় ছেড়ে দাও …

মহিম সচকিত হলো…বেরিয়ে যাবে, এমন সময় খোকনকে বুকে নিয়ে বেয়ারার প্রবেশ। খোকন তার বুকে…হাত-পা ছুড়চে !

মহিম বললে—কি হয়েছে ?

বেয়ারা সভয়ে জানালো, গেট বন্ধ ছিল·· খোকাবাবু গেটে উঠছিলেন …টপকাতে গিয়ে পড়ে গেছেন…

খোকনকে মহিম নিলে বেয়ারার কাছ থেকে, বললে—পড়ে গেছে ?

—জী।

ললিতার যত রাগ গিয়ে পড়লো খোকনের উপর…খিঁচিয়ে উঠলো, —বেশ হয়েছে ! যা মানা করবো, ছেলে তাই করবে ! রাত দুপুরে বিছানা ছেড়ে ফটকে উঠতে গিয়েছিলে…লক্ষীছাড়া হতভাগা ছেলে…মরে গেলিনে কেন ? আমার আপদ যেতো !

বলতে বলতে খোকনকে ছিনিয়ে নিয়ে দুর্দ্দান্ত প্রহার…কিল চড় ঘুষি অজস্র ভাবে।

কোনোমতে খোকনকে উদ্ধার করে ললিতাকে সরিয়ে মহিম বললে—কোথায় লাগলো, দেখি…

ললিতার অধীর গর্জ্জন—না, না, না… ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, ছেলেকে ছেড়ে দাও…একদণ্ড আমাকে কেউ সোয়াস্তিতে থাকতে দেবে না ? আমার চরিদিকে আগুন জেলে রাখবে ! ওকে আজ আমি মেরে

ফেলবো। কেউ রাখতে পারবে না...বলে' হিঁচড়ে ধরে খোকনকে টানাটানি—দাও, আমায় শাসন করতে দাও...

মহিম নিবারণ করে বললে—এখন শাসনের সময় নয়, সরো, এখন ওকে...

পাগলের মতো ললিতা বললে—নিজের ছেলেকে শাসন করবার অধিকার নেই আমার ?

—আছে অধিকার, কিন্তু এখন নয়।

এ-কথা বলে মহিম ছেলেকে নিয়ে নার্শারিতে ঢুকলো। ললিতা নিমেষের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়ালো; তারপর দুম-দুম শব্দে ঘর কাঁপিয়ে ঢুকলো গিয়ে সজ্জা-ঘরে।

ঢুকে টেনে একটা স্যুটকেশ খুললো—তারপর আলমারি খুলে শাড়ী ব্লাউশ পেটিকোট টাকা প্রভৃতি বার করে' স্যুটকেশে ভরলো; ভরে বেয়ারাকে ডাকলো—বয়...

নার্শারিতে খোকনের মাথার কাটায় ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে দিতে দিতে এ-ঘরের এ সব শব্দ মহিম শুনলো। খোকনকে শুইয়ে ধীরে ধীরে এলো ঘরে। এসে দেখলো ললিতাকে...প্রশ্ন করলো—কী করছো ? এ-সব ? এর মানে ?

ললিতা জবাব দিলে না। নিজের মনে কাপড়চোপড় ঠাশতে লাগলো স্যুটকেশের মধ্যে। মহিম কাছে এলো, আবার প্রশ্ন করলো,—কি করছো ললিতা ?

ললিতা এবারে জবাব দিলে; বললে—ঠিক কাজ করছি।

—কি ঠিক কাজ ?

স্যুটকেশটা বন্ধ করে' ললিতা উঠে দাঁড়ালো, বললে—এভাবে আর চলবে না, চলতে পারে না! কারো নয়! তোমার নয়... আমার নয়, খোকনেরও নয়।

মহিম কিছু বুঝলো না, জিজ্ঞাসা করলো,—তার মানে ?

আলমারি বন্ধ করতে করতে ললিতা বললে,—এ-বাড়ীতে আমি আর থাকবো না।

—বাড়ীর অপরাধ ?

ললিতা ড্রেসিং-টেবিল হাঁটকাচ্ছিল, বললে—যে-বাড়ীতে আমি কেউ নই, আমার কোনো মত নেই, কথা খাটে না, প্রতিপদে তোমার অবজ্ঞা সয়ে অপমান সয়ে···দাসী-বাঁদীর অধম হয়ে পড়ে থাকতে হয়, সেখানে আমি আর থাকবো না! সে-রকম ভাবে থাকবার মতো করে' আমার মা-বাপ আমায় মানুষ করে নি।

মহিম কি ভাবলো···তারপর শান্ত স্বরে বললে—তুমি ভুল বুঝছো ললিতা, ভুল করছো!

—ভুল! ললিতা তাকালো মহিমের পানে, বললে—ভুল আমি করিনি। আর যদি করি, আমার ভুল-ভ্রান্তি আমার ভালো-মন্দর জন্ম তোমায় ভাবতে হবে না।

—কিন্তু তোমার ঘর ? তোমার সংসার ?

—সে সব তুমি বিষিয়ে দেছো···তেতো করে' দেছো!

ললিতা চললো দোরের দিকে···সুটকেশটা হাতে ঝুলিয়ে।

মহিম বললে—কিন্তু কোথায় যাবে তুমি? এই রাত্রি···

সতেজে ললিতা বললে—আমার বাবার জায়গার অভাব নেই। আমার বাবার কথা তুমি আজ বড়লোক হয়ে ভুলে গেছ···কিন্তু আমি ভুলিনি। শিলঙে বাবার কাছে যাবো আমি···

—খোকন ?

—তোমাদের কাকেও আমি চাইনে···চাইনে···চাইনে।

ঝঙ্কার তুলে ললিতা এলো সিঁড়িতে···ডাকলো—বয়···

নীচে থেকে সাড়া জাগলো—মেম-সাব···

—ট্যাক্সি।···

—জী···হাজির।

তড়তড় করে ললিতা গেল নেমে···মহিম দাঁড়িয়ে রইলো সিঁড়ির উপর পাথরের মতো নিশ্চল নিষ্কম্প!

ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজলো। নিশীথের বিপুল নিস্তব্ধতা চিরে মাঝে মাঝে আকাশ-পথে চলেছে প্লেন ঘর্ঘর শব্দে···খাটের বিছানায় খোকন ঘুমোচ্ছে···মহিম একটু আগে দেখেছে, খোকনের গা যেন পুড়ে যাচ্ছে···বেশ জ্বর।···

মহিমের চোখে ঘুম নেই···মহিম বসে বসে ভাবছে ···আকাশের অন্ধকারের মতো তারো বুকে ঘন-ঘোর অন্ধকার। এ অন্ধকারে আলোর যে-রশ্মি ফুটেছিল···সে কোন্ সুদূর অতীতে! তখন অভাব ছিল, দারিদ্র্য ছিল···তবু মনে ছিল শান্তি···আশার স্নিগ্ধ জ্যোতি! এখন দারিদ্র্য নেই···অভাব নেই···কিন্তু···

ঘুমের ঘোরে খোকন তার-স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—মা···মা··· না ···আমায় মেরো না···আর আমি ফটকে উঠবোনা···উঠবোনা···

ডিলিরিয়াম! মাথায় চোট, তার উপরে মনে শক্! মহিম ছু গেল খোকনের পাশে···তার মুখে-গায়ে হাত বুলিয়ে ডাকলো— কন··· খোকন···

খোকন চোখ মেলে চাইলো,—বাবা?

—হ্যাঁ, বাবা···

—মাকে বারণ করো···আমায় মারবে না। আমি আর ফটকে চড়বো না।

মহিম বললে—না বাবা, কেউ তোমায় মারবে না···কেউ না! আমি

তোমার কাছে আছি,...তুমি ঘুমোও...আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দি...

সিঁড়ির উপর ল্যাণ্ডিংয়ে ফোন বেজে উঠলো—কি-ড়ি-রিং... কি-ড়ি-রিং...বেয়ারা এসে খবর দিলে, ফোন আয়া।

মহিম বললে—কোন?

—জী...বোলা, শিবানী...

শিবানী! মহিম চমকে উঠলো! এত রাত্রে শিবানী হঠাৎ... বেয়ারাকে বললে খোকনের পাশে থাকতে...হুঁশিয়ার হয়ে... ঘুমিয়েছে। ঘুম না ভাঙ্গে।

বলে' মহিম এসে ফোনের রিসিভার নিলে, বললে—হ্যালো...

সাড়া এলো—ডক্টর রয়?

—হ্যাঁ.. শিবানী? এত রাত্রে কি খবর?

শিবানীর জবাব এলো—হ্যাঁ, এত রাত্রে বিরক্ত করলুম মহিমদা। মানে, বিষ্ণুবাবুর বৌ...তুমি যাবার পর থেকেই খুব বেশী বেশী যেন...

মহিম বললে—হ্যাঁ...ওটা ইনজেকশনের দরুণ রি-এ্যাকশন। যে ওষুধ দিয়েছি, তার দশ ফোঁটা খাইয়ে দাও...তাহলেই ..

শিবানী বললে—একটিবার তুমি আসতে পারবে না? এলে ভালো হতো মহিমদা! ছেলেমেয়েরা যা করছে...

মহিম বললে—যাবার উপায় নেই শিবানী, থাকলে যেতুম। মানে, এখানে খোকনের খুব জর...তার উপর তোমার বৌদি এখানে নেই... কাজেই খোকনকে নিয়ে আমি আছি।

শুনে শিবানী ওধারে চমকে উঠলো! বললে—ও...তা, আমি যেতে পারি মহিমদা? নার্শিং তো কিছু কিছু জানি।

মহিম বললে—তুমি! কিন্তু...

তার কণ্ঠে অনেকখানি সঙ্কোচ।

শিবানী বললে—কিন্তু নয়…আমি এখনি আসছি।

মহিম বললে—কিন্তু শিবানী…

ওদিকে সাড়া নেই! মহিম ডাকলো—হ্যালো…হ্যালো…হ্যালো…

বুঝলো, শিবানী রিশিভার রেখে চলে গেছে।…

মহিম এসে বসলো খোকনের শিয়রে…বেয়ারাকে বললে—যাও…

বেয়ারা চলে গেল। খোকনের কপালে মহিম হাত রাখলো…কপাল যেন আগুন! উঠলো। পেয়ালায় ছিল ওডিকলোঁর জল…তাতে রুমাল ভিজিয়ে খোকনের কপালে পটী চেপে চুপ করে' মহিম বসলো… বুকের মধ্যে চিন্তার অজগর ফুঁশছে!…

আধ-ঘণ্টা পরে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে শিবানী ঢুকলো ঘরে…বেয়ারার সঙ্গে। শিবানীকে পৌঁছে দিয়ে বেয়ারা চলে গেল। শিবানী এসে দাঁড়ালো বিছানার পাশে…মৃদু-কণ্ঠে ডাকলো—মহিমদা…

মহিম তাকালো, বললে—এসেছো!

—হ্যাঁ। এখন টেম্পারেচার?

—একটু আগে দেখেছি…১০৩।

—হঠাৎ? কৈ, তুমি যখন গিয়েছিলে, বলোনি তো।

—না। হঠাৎই হয়েছে! মাথায় চোট লেগেছে…তার উপর একটা মেণ্টাল শক্…

শিবানী পা-হাত ধুয়ে এসে খোকনের শিয়রে বসলো…তার সেবার ভার নিয়ে…

৬

সঙ্গে মহিম নেই, খোকন নেই··· ললিতা একা এলো শিলঙয়ে, খবর না দিয়েই! দেখে কর্ণেল চৌধুরী চমকে উঠলেন! তিনি বললেন—তুমি হঠাৎ ···এমন করে?

—এলুম। ···কেন, আসতে নেই?

—আসতে থাকবে না কেন? তবে তোমার স্বামী···ছেলে···সংসার ···এ-সব ফেলে?

ললিতা বললে,—আর সহ্য হলো না প্রতিপদে অবজ্ঞা অপমান সয়ে সেখানে থাকা। স্বামী আপন নয়, ছেলে আপন নয়! যার যা খেয়াল, সে তাই করবে···সব-কিছুতে···আমাকে ঠেলে···

কাল্পনিক দুর্দ্দশার এক সুদীর্ঘ অভিযোগ ললিতা দাখিল করলো বাপের কাছে!

কর্ণেল চৌধুরী উৎকণ্ঠিত মনে অভিযোগ শুনলেন···শুনে আতঙ্কিত কণ্ঠে বললেন—না, না, না লিলি, এ তুমি যাই বলো···আমি এ-কথা বিশ্বাস করতে পারবো না যে মহিম তোমায় অপমান বা অবহেলা করেন।

লিলি গর্জ্জন করে উঠলো—শুধু অপমান? আচারে ব্যবহারে প্রতিপদে জানিয়ে দেয় আমি যেন তার কেনা বাঁদী! আশ্চর্য্য··· তোমার দয়া, তোমার সাহায্য না পেলে যে আজ মানুষ হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতো না, সে কি না···

বাধা দিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কর্ণেল বললেন—লিলি···

চকিতে সে ভাব সম্বরণ করলেন, বললেন—তোমার মায়ের মৃত্যুর পর সংসার ছেড়ে এখানে চলে এসেছি···ভেবেছিলুম, তোমাদের

সংসার তোমরাই সব ভার নিয়ে সেখানে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করবে··· আমিও শান্তিতে থাকবো। আমার এ শান্তিটুকু তুমি···

ললিতা তাকালো বাপের পানে···ভ্রূকুটি-ভরা দৃষ্টিতে···বললে—তা বলে···

কর্ণেল বললেন—ভুলে যেয়োনা লিলি, আমিই উপযাচক হয়ে মহিমকে এ বিবাহে রাজী করিয়েছিলুম···এর জন্য আমিই তার কাছে অণুগৃহীত···সে অনুগৃহীত নয়।···আর মানুষ হওয়া? মহিম মানুষ হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, এ তার নিজের গুণে, নিজের শক্তিতে! কারো দয়ার বা সাহায্যের প্রত্যাশা সে রাখে না!

ললিতা বললে—কিন্তু তার এখনকার পরিচয় তো তুমি জানো না! জানলে···তার নিজের কথা ছেড়ে দিই···ছেলেকে পর্য্যন্ত এমন স্পয়েল করেছে যে এই বয়সেই সে আমার প্রতিপদে অগ্রাহ্য করে। যা আমি দেখতে পারিনা, তাই করবে! ছোটলোকের মতো পথে বেরিয়ে হৈ চৈ করতে চায়···বারণ করবার যো নেই। বারণ শোনে না···ওঁর কাছে প্রশ্রয় পায়। না, না, এ সব আমি কিছুতে বরদাস্ত করতে পারবো না।

কর্ণেল চৌধুরী বললেন—কি করবে? এমনি করে সব ছেড়ে চলে আসবে? জিদের বশে এ কি সর্ব্বনাশ করতে বসেছো নিজের! ···মনে রেখো, এখন তুমি আর সেই ছোট্ট লিলি নও···এখন মা হয়েছো ···কত-বড় দায়িত্ব এখন তোমার! ছেলেকে মানুষ করতে হ··· কত বুঝে, কত সয়ে চলা দরকার এখন। ধৈর্য্য ধরতে হবে তোমাকে। তা নয়···তুচ্ছ কারণে জেদের বশে বাড়ী ছেড়ে চলে আসবে!···না, না, এর সমর্থন আমি কখনো করবো না···কিছুতে না। তোমায় ফিরে যেতে হবে লিলি।

—আমি যাবো না!

—যাবে না ?

—না।

—আমার অবাধ্য হবে ?

সতেজে ললিতা বললে,—হবো। বলে' তিড়বিড় করে' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হতাশ নিরুপায়ের দৃষ্টিতে কর্ণেল চৌধুরী দরজার পানে তাকিয়ে রইলেন।

কলকাতার বাড়ীতে খোকনের জ্বর ছেড়ে গেছে··· মাথার ব্যাণ্ডেজ এখনো খোলা হয়নি···শিবানী তাকে সেবায় স্নেহে এমন করে' রেখেছে ···শিবানীকে খোকন একদণ্ড ছাড়তে চায় না!

শিবানী গিয়েছিল স্নান করতে···তার দাসী দুধের গ্লাস এনে মুখে ধরলো। এক-চুমুক পান করে' মুখ ভেংচে খোকন বললে—উঃ বিচ্ছিরি···এ আমি খাবো না।

দাসী বললে—দুধ বিচ্ছিরি! বটে! খাও···

দাসীর জেদ···খোকন বলে—না, আমি খাবো না।

ঘরে ঢুকলো শিবানী · বাদ-প্রতিবাদ শুনলো। এগিয়ে এসে খোকনকে বললে—ছি···দুষ্টুমি করো না খোকন! তুমি যে লক্ষ্মী ছেলে, দুধ খাও। তারপর এই দ্যাখো··· বলে' সে দেখালো বিস্কুটের একটা প্যাকেট! বললে,—দুধ না খেলে বিস্কুট পাবে না।

খোকন বললে—ওর কাছে আমি খাবো না··· তোমার কাছে খাবো।

—আমার কাছে ?···বেশ! বলে' দাসীর কাছ থেকে দুধের গ্লাস নিয়ে শিবানী সেই গ্লাস ধরলো খোকনের মুখে। খোকন ভালো মানুষ হয়ে দুধের গ্লাসে চুমুক দিলে।

দেখে দাসী যেন জ্বলে উঠলো! চিরকাল আমার হাতে সব

হচ্ছে…আজ কোথা থেকে ইনি এসে যেন সর্বময়ী হয়েছেন! তাদের উপরেও হুকুম চালান্! দাসী দুম-দুম করে বেরিয়ে গেল।

শিবানী বললে-— এই তো বেশ খাচ্ছো! দুধ তো বিচ্ছিরি নয়! কেন ওর কাছে খাচ্ছিলে না?…ছি, দুষ্টুমি করতে আছে? তুমি কত ভালো হবে‥ লক্ষ্মী হবে…সকলে তোমায় ভালো বলবে! এবার থেকে সকলের কথা শুনবে …কেমন?

দুধ খাওয়া শেষ হয়ে গেলে শিবানীর হাতে গ্লাস দিয়ে খোকন বললে—লক্ষ্মী হবো।

শিবানী বললে—হ্যাঁ।

শিবানী দিলে দুখানি বিস্কুট…খেতে খেতে খোকন বললে—তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে…মার চেয়েও…কেন?

শিবানীর দেহে-মনে আনন্দের আবেশ…শিবানী বললে—তুমি বলো, কেন ভালো লাগে!

খোকন বললে—তুমি আমায় বকো না…মারো না…কত আদর করো…আমায় কত গল্প বলো‥আমার সঙ্গে খেলা করো!…মা কিন্তু কখনো কাছে ডাকতো না, আর সব-তাতে বকতো আমায়…কখনো আদর করতো না মা! জানো, মা আমাকে মাঠে যেতে দিতো না…ওখানে ছোটলোকরা আসে বলে'!…তুমি আমায় মাঠে যেতে দেবে?

—দেবো‥ আগে তুমি ভালো করে' সেরে ওঠো…

খোকন বললে—জানো, রাত্তিরে যখন ঘুমোই, তখন ঐ মাঠে ছেলেরা এসে খেলা করে…ফুটবল! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি দেখতে পাই…শুনতে পাই, তারা চ্যাঁচাচ্ছে 'গোল-গোল' বলে'!

হেসে শিবানী খোকনের গালে মৃদু টোকা মারলো, বললে—পাগল ছেলে! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেউ বুঝি কিছু দেখতে পায়?

খোকন মাথা নেড়ে বললে,—হ্যাঁ, সত্যি, আমি দেখেছি! আমি শুনেছি!

শিবানী বললে—সে তুমি স্বপ্ন দেখেছো!

—স্বপ্ন!···খোকন কি ভাবলো! তারপর আবার বললে—স্বপ্ন কি?

শিবানী বললে—স্বপ্ন? জেগে যা চোখে দেখা যায় না, সেই হলো স্বপ্ন। স্বপ্ন কখনো সত্যি হয় না খোকন···

কথার শেষে একটা নিশ্বাস বুক থেকে বেরিয়ে এলো। খোকন নিরুত্তর··কি ভাবতে লাগলো।

শিবানী বললে—ভাবতে হবে না খোকন-বাবু, তোমার মাথার ব্যাণ্ডেজ খোলা হলেই তোমাকে মাঠে নিয়ে যাবো···তোমাকে ফুটবল কিনে দেবো···মাঠে গিয়ে তুমি ফুটবল নিয়ে খেলা করো। তাছাড়া কত-কত জায়গায় নিয়ে যাবো···মোটরে করে', ষ্টীমারে করে'···

—ষ্টীমারে! খোকনের দু' চোখ আশার আলোয় ঝক্‌ঝক্ করে' উঠলো। মহিম আসছিল···খোকনের কথা কাণে গেল···মহিম দিলে জবাব—হ্যাঁ খোকন বাবু, ষ্টীমারে।

মহিমের স্বর শুনে শিবানী ফিরে তাকালো, বললে—মহিমদা!

—হ্যাঁ।

—এমন সময়ে তুমি!

মহিম বললে,—একটু অবকাশ মিললো, তাই দেখতে এলুম তোমরা দুজনে কি করছো। তাছাড়া খোকনের ব্যাণ্ডেজ খুলে দেবো আজ।

ব্যাণ্ডেজ খোলা হলো।···কপালের ঘা সেরে গেছে···একটা কাটা দাগে চিহ্ন রয়ে গেছে শুধু!

খোকন বললে—সত্যি, ষ্টীমারে বেড়াতে যাবো বাবা?

—হ্যাঁ।

—কবে?

—যদি বলি, কাল ?

—হ্যাঁ…কাল যাবো।

পরের দিন…ষ্টীমারে চড়ে' বেড়িয়ে বাড়ী ফেরা…রাত প্রায় নটা… শিবানীর সঙ্গে খোকনের গল্প চলেছে…ষ্টীমার-ট্রিপের বৈচিত্র্য নিয়ে।

খোকন বলছিল—কেমন ভোঁ-ভোঁ করে' বাঁশী বাজিয়ে…আর কত ঢেউ !

শিবানী বললে—হুঁ ! ষ্টীমার তোমার খুব ভালো লেগেছে

—খু-উ-ব্।…তোমার লাগেনি।

—আমারো খু-উ-ব ভালো লেগেছে ! কিন্তু আর নয়, অনেক কথা হয়েছে…এখন ঘুমোও। সারাদিন আজ বড্ড ধকল গেছে, রাত হয়েছে…।

খোকন বললে—আমার ঘুম পায়নি।

—না পাক্, তবু চোখ বুজিয়ে শুতে হবে। না হলে আমি রাগ করবো।

—তুমি গল্প বলো…

—বেশ, চোখ বুজে শুনতে হবে কিন্তু…চোখ চাইলেই আমি আর বলবো না…তোমার কাছ থেকে চলে যাবো।

শিবানী গল্প আরম্ভ করলো…

পনেরো মিনিট…খোকন ঘুমে অচেতন…

শিবানী উঠে খড়খড়ির পর্দ্দা টেনে সরিয়ে দিলে…তারপর নিঃশব্দ পায়ে পাশের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ… জ্যোৎস্নায় চারিদিক ছেয়ে গেছে। গাছের পাতায় পাতায় বাতাসের মৃদু মর্ম্মর…আকাশ-পৃথিবী যেন জ্যোৎস্না মেখে একাকার !

শিবানীর মনে পড়ছিল ছেলেবেলাকার কথা···সেই গ্রাম···গ্রামের সেই পথ-ঘাট! মাথার উপর খোলা আকাশ···অত দুঃখ-পীড়নের মধ্যে ঠানদির কাছে নিরাপদ আশ্রয়। আর মহিমদা! মহিমদার কাছে জীবনের সে কি পরিচয়-লাভ! মহিমের দরদে স্নেহে পৃথিবীকে কি চোখেই না দেখতো শিবানী! তারপর কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল···

নিজের অজ্ঞাতে গান কখন মন থেকে অধরের ভাষায় ফুটলো··· রবীন্দ্রনাথের গান—

সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে···

বাতাস যেমন নিজে থেকে জেগে নিজে থেকেই ঘুমিয়ে পড়ে··· শিবানীর কণ্ঠে গানও তেমনি নিজে থেকে নিঃসৃত হয়ে নিজে থেকেই মিলিয়ে গেল। একটা নিশ্বাস···

সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে ডাকলো মহিম—শিবানী···

চমকে ফিরে তাকালো শিবানী···বললে—মহিমদা!

দুজনে চুপ। শিবানী হাসলো···অতি-মলিন মৃদু হাসি, বললে— আমার আজ কি যেন হয়েছে! এই চাঁদের আলো···আকাশ-বাতাস··· গ্রামের সেই সব পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ছিল!

আর একটা নিশ্বাস! শিবানী বললে,—খোকন তো সেরে উঠেছে মহিমদা···আমায় এবার ছুটি দাও।

মহিম বললে—ছুটি!···কথার সঙ্গে খানিকটা নিশ্বাসের বাষ্প··

শিবানী বললে—হ্যাঁ। যার মন সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে পথে বেরিয়েছে···ঘরের মায়ায় মিথ্যা তাকে আর বেঁধে কি লাভ?

মহিম বললে—কিন্তু কোন্‌টা সত্যি, আর কোনটা মিথ্যা, তার মীমাংসা জীবনে আজ পর্য্যন্ত কেউ করতে পেরেছে শিবানী?

শিবানী জবাব দিলে না···

মহিম বলতে লাগলো—রূপকথার গল্পে শুনেছি···রাজ্য আছে···

সে-রাজ্যে রাজা-রাণী, রাজপুত্র, রাজকন্যা, প্রজা···সব আছে···কিন্তু প্রাণ নেই কারো! সব পাষাণ হয়ে আছে। কে নাকি একদিন মায়া-কাঠির স্পর্শ দিয়ে সে-রাজ্যকে জীবন্ত করে তুলেছিল···

মহিম একটা নিশ্বাস ফেললো···ফেলে বললে—এ-বাড়ীও এত-কাল পাষাণ হয়ে ছিল শিবানী! তোমার হাতের মায়া-কাঠির স্পর্শে এ বাড়ী যদি আজ প্রাণ পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠে থাকে···

প্রশ্ন-ভরা দৃষ্টিতে মহিম চেয়ে রইলো শিবানীর পানে।

শিবানী বললে—কিন্তু মহিমদা, আমি দুদিনের অতিথি···কি আমার অধিকার?

মহিম বললে,—অধিকার আমারো নেই শিবানী যে তোমাকে ধরে রাখি! আর 'তুমি যাও' এ-কথাও তোমাকে আমি কোনো দিন বলতে পারবো না!···তবে তুমি যদি থাকো, তো এইটুকু জানবো···

কথা রুদ্ধ হলো!

শিবানী বললে—মহিমদা···বাষ্পোচ্ছ্বাসে তারো কথা গেল রুদ্ধ হয়ে।

মহিম বললে—যদি কখনো ছাখো শিবানী, তোমার চোখের সামনে একটা মানুষ জলে ডুবে অতলে তলিয়ে মরতে চলেছে, তাকে তোলবার জন্য তোমার হাতখানি তুমি বাড়িয়ে দেবে না? তাকে বাঁচাবে না?

শিবানীর দু'চোখ জলে ভরে এলো···রুদ্ধ কণ্ঠে শিবানী বললে—মহিমদা তুমি সুখে আছো, শান্তিতে আছো···এই মনে করে নিজের মনে আমি কতখানি শান্তি পেয়েছিলুম! আর আজ চোখে যা দেখছি, ···তোমার মতো দুঃখী পৃথিবীতে বুঝি আর কেউ নেই!

মহিমের বুক দুলে উঠলো···মহিম বললে—তোমার কাছে গোপন করবার আমার কিছু নেই শিবানী! সেদিন রাত্রে একা...খোকনকে

নিয়ে কি অসহায় মনে হয়েছিল নিজেকে! তুমি যখন এলে,...

কণ্ঠ রুদ্ধ হলো। কণ্ঠ পরিষ্কার করে' মহিম বললে—তোমার চেয়ে পৃথিবীতে বড় বন্ধু আমার আর কেউ নেই শিবানী...যাক্...অনেক রাত হলো...শুয়ে পড়োগে।

—যাই...

দুজনে দুদিকে চলে গেল...নিজের নিজের ঘরে।

মহিমের চোখে ঘুম নেই...কত চিন্তা...মনে যে-সব স্বপ্ন রচনা করতো, সেই সব স্বপ্নের টুকরো হালকা মেঘের মতো চোখের সামনে দিয়ে ভেসে চলেছে...নাগালের বাহিরে...অনেক ঊর্দ্ধ দিয়ে...ও-সব স্বপ্ন আজ মনের কোণেও ঘেঁষ দেয় না!

তারপর খোকনের নিত্য বায়না আবদার! আজ সার্কাস...শুধু শিবানীকে নিয়ে নয়...মহিমকেও সঙ্গে চাই!...বালী-ব্রিজ...মহিম আর শিবানী দুজনের সঙ্গে! মাঠ...বাট...মহিমকে শিবানীকে সঙ্গ দিতে হয়!

খোকনের মনকে সুস্থ স্বচ্ছন্দ করে তুলতে এ সব আবদারে "না" বলা চলে না।

এবং এর ফলে ওদিকে শিলঙের বাড়ীতে...

বান্ধবী আভা, নিভা, রেবা, মনোরমা, তালুকদারদের চিঠিতে কত রকম ইঙ্গিত...

শিলঙের বাড়ী...বিকেলে বাগানে বসে কর্ণেল চৌধুরী খবরের কাগজ পড়ছেন...সামনে বেতের গোলটেবিল...টেবিলে কোকোর পেয়ালা, বিস্কুট...

লিলি এলো···যেন দমকা হাওয়ার ঝলক! [illegible],—বাবা···

কণ্ঠে প্রচুর অস্বস্তি···উত্তেজনা!

চোখ তুলে কর্ণেল চাইলেন মেয়ের পানে।

ললিতা বললে—এই ছাখো চিঠি। এখানা লিখেছে অনীতা··· আর এখানা মিসেস ঘোষ···

সবিস্ময়ে কর্ণেল চৌধুরী বললেন—কি লিখেছেন?

ললিতা বললে—সে আমি মুখে বলতে পারবো না···চিঠি পড়ে তুমি ছাখো।

চিঠি দুখানা বাপের হাতে ললিতা গুঁজে দিলে। কর্ণেল চৌধুরী পড়লেন···শিবানীর সম্পর্কে মহিমের বিরুদ্ধে কদ[illegible] কতকগুলো অভিযোগ···তাদের অন্তরঙ্গতা···সার্কাসে এক-বক্সে দুজনকে [illegible]খেছে অনীতা···ষ্টীমারে এক-সঙ্গে যেতে দেখেছে মিসেস ঘোষ শিবপুরের বটানিক্‌সে···

চিঠি পড়ে চৌধুরী চাইলেন মেয়ের পানে···সংশয়-ভরা দৃষ্টিতে··· বললেন—না, না, এ হতে পারে না লিলি। এ আমি বিশ্বাস করি না। দে আর মিস্‌টেক্‌ন্‌···

—বিশ্বাস করো না? ললিতার দু'চোখে আগুন! ললিতা বললে— এ মিথ্যা কথা বলে তাদের লাভ?···তুমি জানো না, এই শিবানী হলো তার পুরোনো বান্ধবী···বস্তীতে থাকে···তার সঙ্গে নিত্য চলে [illegible]র জামাইয়ের···

চৌধুরী হুঙ্কার দিলেন—লিলি···

সে-ডাক কাণে না তুলে ললিতা বললে—আমাকে তুমি সেখানে যেতে বলো! তার উপর তোমার বিশ্বাস অটল হলেও আমি তাকে মোটে বিশ্বাস করি না···প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত্ত তার সঙ্গে এক-বাড়ীতে বাস···না, না, না···তাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই!···

কথাটা বলে ঝড়ের ঝাপটার মতো ললিতা গেল চলে'।

কর্ণেল চৌধুরী স্তম্ভিত···তারপর মনে নানা কথার ভিড়···এবং সে ভিড়ের তাগিদে রাত্রে তিনি ফোন্ করলেন···কলকাতা...মহিমের বাড়ীতে···দশটার সময়।

সাড়া মিললো।

কর্ণেল সতর্কভাবে রিসিভার নিলেন—ডক্টর মহিম রায়ের বাড়ী ?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—ডক্টর রয় আছেন ?

—না। কল থেকে ফেরেননি এখনো। বলুন, আপনার কি দরকার ?

মেয়ের কণ্ঠ! অল্পবয়সী মেয়ে! এ কণ্ঠ তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত। মেয়ে কে এলো বাড়ীতে ? একটা সংশয়ের খোঁচা···

কর্ণেল প্রশ্ন করলেন—আপনি কে ?

—আমি···আমি···আমি এই বাড়ীতেই থাকি।

—আপনার নাম ?

—নাম !

—হ্যাঁ···হ্যাঁ···দরকার আছে।

—আমার নাম শিবানী। ডক্টর রয়কে কিছু বলতে হবে ?

—না···না···কিছু না। কর্ণেল চৌধুরী রিসিভার রেখে বসে পড়লেন।·· চিঠিগুলো তাহলে···

কিন্তু এমন অধঃপাতে মহিম যেতে পারে ?···কর্ণেল চৌধুরীর চোখের সামনে ঘর-বাড়ী যেন দুলতে লাগলো···যেন ভূমিকম্প হচ্ছে !

এখানেও দু'চারটে কদর্য ইঙ্গিত !···দাসী-চাকরের নোংরা মন··· তাদের মধ্যে হাসাহাসি...শিবানীকে মনিব এতখানি মানে! খোকন শিবানীকে ছাড়ে না! মনিবকে তারা এমন কোনো দিন দেখেনি। গাড়ী

করে' মেম-সাহেবের সঙ্গে বেড়াতে যান…গল্প হাসি গান…এর একটি মাত্র অর্থই তারা অনুমান করতে পারে। মেম-সাহেব এখানে নেই, সেই ফাঁকে কোথা থেকে এই নার্সটা এসে রূপ আর বয়সের জোরে মনিবকে একেবারে…

আগুনের কুঁচির মতো শিবানীকে এ-ইঙ্গিত স্পর্শ করলো…অকস্মাৎ। এ-সব কথার টুকরো…সে বুঝলো, না, না, এ ঠিক নয়।

সন্ধ্যার পর মহিমের সঙ্গে দেখা। শিবানী বললে—আর ভালো দেখাচ্ছে না মহিমদা এখানে আমার থাকা। আমি এবার যাই।

—খোকনকে ছেড়ে পারবে যেতে?

—পারা শক্ত। তবু না গেলেও চলে না!

—কেন? কোথায় তোমার বাধছে শিবানী? আমাদের সুখ? হাসি? আনন্দ?

কোনোমতে শিবানী বললে—তা নয় মহিমদা।

—তবে?

—বৌদি এখানে নেই…আমি এসে রয়েছি…পাঁচজনে হয়তো…

মহিম তুললো প্রতিবাদ। বললে—পাঁচজনে? যদি মিথ্যা দুর্নাম করে, সেই মিথ্যাকে বড় করে দেখবে?

—তা নয় মহিমদা। দুর্নামেই অনর্থপাত ঘটে। কজন মানুষ মানুষের সঠিক পরিচয় জানে? জানতে চায়, বলো? তাছাড়া আমার যে-কাজ · তোমার নামে মিথ্যা করে'ও কেউ কিছু বলবে, আমার তা সহ্য হবে না।

এ-কথার জবাব নেই। মহিম একটা নিশ্বাস ফেললো; ফেলে বললে—তোমার যা ভালো মনে হয়, করো। আমার বলবার কিছু নেই, শিবানী! তবে…

কথা শেষ না করে' মহিম চলে গেল।

শিবানী বসে ভাবে। ভাবে, একটি ভুলের জন্য…হায়রে, সে ভুল জীবন দিলেও আজ শোধরানো চলে না। নাহলে…ঘর-সংসার…এমন ছেলে…তার বুকেও কত-বড়…কত-রকমের সাধ ছিল!

দুচোখে জল এলো। চোখের জল মুছে শিবানী ভাবলো, এ-সব কথাও মনে আসে এখনো! আশ্চর্য্য! না, না…এখানকার মায়ার বাঁধন কেটে যেতেই হবে তাকে! ঘর তার সাজে না! তার জন্য আছে শুধু পথ…সেই পথেই সে চলে যাবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর খোকনকে লুকিয়ে শিবানী নিজের ছোট পুঁটলিটি নিয়ে চলে যাবে, খোকন একটা মুখোস এঁটে এলো তাকে ভয় দেখাতে। শিবানীর যাত্রার উদ্যোগ সে বুঝলো…বুঝে মুখোস ফেলে শিবানীকে জড়িয়ে ধরলো, বললে—এ্যাঁ, কোথায় যাচ্ছো তুমি?

দুপায়ে মায়া-মমতা চেপে-পিষে শিবানী বললে—বাড়ী যাবো না বুঝি? বারে, আমার বাড়ী?

—না। এই তো তোমার বাড়ী! এ-বাড়ী ছেড়ে তুমি কোথাও যাবে না…কোথাও না…

এ-ছেলেকে শিবানী কি করে'…কি বলে' বোঝাবে যে সে কেউ নয়, তার কেউ নয়! খোকন মিথ্যা তাকে আঁকড়ে ধরতে চায়!…কেন? কেন সে…

খোকন বললে—গল্প বলো…গল্প…

—বেশ, বলবো—কিন্তু চোখ বুজে শুনতে হবে। গল্প শুনতে শুনতে ঘুমোবে, বলো?

খোকন বললে—ঘুমোবো।

পুঁটলি রেখে খোকনকে নিয়ে শিবানী বসলো গল্প বলতে…

শিবানী বলছিল—এক রাজার ছেলে···বনে বাঁশী বাজিয়ে বেড়ায় রোজ সন্ধ্যা বেলায়। কুঁড়ে ঘরে থাকে এক গরীবের মেয়ে। বাঁশী শুনে কুঁড়ে ছেড়ে সে আসে বেরিয়ে—শিউলি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাঁশী শোনে। ফোটা শিউলির গন্ধে বন ভর-ভর করছে···তার উপর বাঁশীর স্বর···গরীবের মেয়ে সব দুঃখ, সব অভাব ভুলে যায়···

হঠাৎ যেন ঝড় এলো! ঘরে ঢুকলো দমকা বেগে ললিতা···পিছনে কর্ণেল চৌধুরী।

মূর্ত্তি দেখে খোকন এতটুকুন! শিবানীর বুঝতে বিলম্ব হলো না, কে! খোকনকে ছেড়ে শিবানী উঠে দাঁড়ালো।···খোকন উঠে শিবানীকেই আঁকড়ে ধরলো।

ললিতা দেখলো। দুচোখে আগুন ভরে সে-আগুন শিবানীর সর্ব্বাঙ্গে ছিটিয়ে ললিতা বললে—তুমি শিবানী?

ভীত জড়িত মৃদু কণ্ঠে ললিতা বললে—হ্যাঁ।

—বুঝেছি! ললিতা যেন রণরঙ্গিনীর মূর্ত্তি ধরলো, বললে—আমি এখানে নেই, সিংহাসনে বসে খুব আনন্দ করছো!···লজ্জা করে না··· ভদ্র ঘরে এমন বেহায়ার মতো···

এ-সব কথার পিছনে কি কদর্য্য ইঙ্গিত! শিবানীর আপাদ-মস্তক ঘৃণায় ধিক্কারে ঘিন-ঘিন করে উঠলো। শিবানী বললে—বৌদি···

—থামো, থামো···বৌদি বলে আর সোহাগ জানাতে হবে না। যাও, বেরিয়ে যাও, এখনি বেরিয়ে যাও। এ আমার বাড়ী··· এ-বাড়ীতে আর একদণ্ড নয়···

পুঁটলি নিয়ে শিবানী নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে···কর্ণেল চৌধুরী সরে পথ ছেড়ে দিলেন।

খোকন থাকতে পারলো না, উচ্চ ক্রন্দনে ফেটে পড়লো যেন! সে ছুটলো শিবানীর পিছনে, বললে,—আমি···আমি···আমি তোমার সঙ্গে যাবো···

ললিতা ধরলো ছেলের হাত চেপে। ধমক দিয়ে বললে—তবে রে পাজী, লক্ষীছাড়া ছেলে! ঠাশ-ঠাশ করে বিপর্য্যয় চড়ে মনের যত আক্রোশ ললিতা বর্ষণ করলো ছেলের উপর।

কর্ণেল চৌধুরী এসে ছাড়িয়ে নিলেন। খোকনকে তিনি বললেন,—না, তুমি যাবে না ওর সঙ্গে।

খোকনের কান্না···সে-কান্নায় ভিজে দুম্‌ড়ে শিবানী বেরিয়ে গেল, বাড়ীর ফটক ছেড়ে সোজা সদর-রাস্তায়···

পাশ দিয়ে ঢুকলো মহিমের গাড়ী। গাড়ীতে মহিম···আসছিল কতখানি স্বপ্ন নিয়ে···বিশ্রাম-সুখের স্বপ্ন···খোকন···শিবানী···তাদের সঙ্গে হাসি-গল্প···

গাড়ী থেকে নেমে শুনলো খোকনের কথা···

সিঁড়িতে এলো···চোখ পড়লো কর্ণেল চৌধুরী আর ললিতার উপর! মহিম স্তম্ভিত।

কর্ণেলকে দেখে মহিম অবাক···প্রশ্ন করলো—আপনি হঠাৎ?

কর্ণেল চৌধুরী নিশ্বাস ফেললেন···বেশ বড় নিশ্বাস। সে নিশ্বাসে তাঁর সহজ চেতনার উপর থেকে সঞ্চিত অনেক ধূলি-বাষ্প যেন ছিটকে বেরিয়ে গেল···চেতনা স্বচ্ছ হলো!

কর্ণেল বললেন—হ্যাঁ। হঠাৎই আসতে হলো। তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে। এসো···

বলে' মহিমকে নিয়ে তিনি ঢুকলেন পাশের কামরায়···ঢুকে মহিমের হাতে একখানা চিঠি দিলেন, বললেন—পড়ো···

সবিস্ময়ে মহিম চিঠি নিলে। ললিতার বান্ধবীদের লেখা সেই চিঠি ···পড়ে বললে—হুঁ, পড়লুম। এর মানে?

কর্ণেল বললেন—মানে তুমিই বলো···তোমার কাছে জানতে চাই।

কর্ণেলের স্বর গম্ভীর···দৃষ্টি স্থির অবিচল···মহিমের মুখে নিবদ্ধ!

ঘৃণায় মহিমের মন রী-রী করে উঠলো··· সুদৃঢ় কণ্ঠে মহিম বললে—এ সব আপনি বিশ্বাস করেন?

কর্ণেল চৌধুরী বললেন—আগে করিনি···ললিতা কাণের কাছে নিত্য সেখানে ঘ্যান্ঘ্যান্ করেছে···আমি কাণে তুলিনি। কিন্তু কাল তোমায় টেলিফোনে ডেকে তার জবাবে যখন এক অজানা স্ত্রীলোকের গলা শুনলুম···

গভীর শ্লেষ-জড়িত কণ্ঠে মহিম বললে—অমনি আপনার বিশ্বাস টল্‌লো···এত কাল ধরে আমায় ভালো করে জেনেও? একবার মনে হলো না, হঠাৎ আমি···

বাধা দিয়ে কর্ণেল বললেন—মানুষের মতিভ্রম হঠাৎই হয় মহিম! পৃথিবী বড় কঠিন জায়গা···পিছল পথ ··মানুষকে এ-পথে ভারী হুঁশিয়ার হয়ে চলতে হয়। লিলি এখানে নেই···তার অনুপস্থিতিতে একজন অনাত্মীয়া স্ত্রীলোক এসে যদি বাড়ীতে বাস করে, আর তাকে নিয়ে তুমি ষ্টীমারে মোটরে ঘুরে বেড়াও···সার্কাসে যাও, তাহলে··তাছাড়া এখানে এসে চোখে যখন দেখলুম, সেই অনাত্মীয়া স্ত্রীলোকটি লিলির ঘরেই খোকনকে নিয়ে!···তুমি বোঝো না মহিম, খোকনকে ভুলিয়ে বশ করা···তার মানে, তোমার মনে দরদ জাগিয়ে তোলা···অর্থাৎ···না, না, এ টলারেট করা চলে না। আমরা এসে তখনই সে-স্ত্রীলোককে বার করে দিয়েছি।

এ কথায় মহিমকে যেন তিনি পদাঘাত করলেন! মহিম চমকে

উঠলো! চম্‌কে মহিম বললে,—বার করে' দেছেন!

মহিমের স্বর বেশ রূঢ়!

কর্ণেল চৌধুরী তাতে দমলেন না। দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বললেন—হ্যাঁ, সংসারে শুচিতা রক্ষা করা প্রয়োজন!

শ্লেষ-ভরে মহিম বললে—শুচিতা! সংসারের শুচিতা রক্ষা করতে তাঁকে তাড়িয়ে দেছেন! কিন্তু জানেন কাকে তাড়িয়ে দেছেন?

মহিমের কণ্ঠে এমন স্বর কর্ণেল চৌধুরী কখনো শোনেননি··· শোনবার প্রত্যাশা করেননি! তিনি স্তম্ভিত দৃষ্টিতে মহিমের পানে চেয়ে রইলেন।

মহিমের সেদিকে লক্ষ্য নেই! মহিম বললে—যাঁর ঋণ···আপনি, আমি, আপনার কন্যা লিলি ইহ-জীবনে শোধ করতে পারবো না।

বিস্মিত স্তম্ভিত কর্ণেলের কণ্ঠে নিঃসৃত হলো একটি মাত্র কথা,—ঋণ!

—হ্যাঁ, ঋণ! খোকনের অত-বড় এ্যাক্সিডেণ্ট দেখেও আপনার কন্যা ···খোকনের মা নিজের জেদ বজায় রাখতে যেদিন এখান থেকে চলে গেলেন···সেদিন এই অনাত্মীয়া স্ত্রীলোকটিই খোকনের অসুখের খবর পেয়ে নিজে যেচে এসে খোকনের সেবার ভার নেন। নিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তোলেন।

কর্ণেল চৌধুরীর দৃষ্টি স্তম্ভিত!

—শুধু তাই নয়···নিজের মায়ের কাছ থেকে খোকন জীবনে যে স্নেহ যে মমতা কখনো পায় নি···এই অনাত্মীয়া মহিলা সেই স্নেহ-মমতা দিয়ে খোকনের মনকে সুস্থ সহজ করে' তুলেছেন। অনাত্মীয়া হলেও এ-মহিলাকে আমি শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি··· তাঁর সঙ্গে আমার যে-সম্পর্ক, তাতে এতটুকু দূষিত বাষ্প নেই! বিশেষ···

কর্ণেল চৌধুরীর মনের উপর হাতুড়ির ঘা পড়লো···মন থেকে ঝরে

গেল ভিত্তিহীন সংশয়! অপরাধীর কুণ্ঠিত স্বরে তিনি বললেন—তুমি… তুমি এ কী বলছো মহিম! খোকনের এ্যাকসিডেণ্ট…আমি তো এ-সব কিছু জানি না।

মহিম বললে—না জানাই সম্ভব। কারণ এ-সব ছোট কথা জানা বা জানানো, এই সব হাই-ব্রাউদের পক্ষে সম্ভব নয়! আর তার প্রত্যাশাও আপনি করতে পারেন না! আপনার কন্যার এই সব হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু…খোকনের কোনো খবর জানতে বা জানাতে এতটুকু ঔৎসুক্য এঁদের থাকতে পারে না! কিম্বা জানাতে হয়তো ভুলে গেছেন! গশিপ্ সৃষ্টি করতে পারলে ওঁরা…কিন্তু না, আমায় ক্ষমা করবেন…এখনি আমায় যেতে হবে।

কর্ণেল চৌধুরী প্রশ্ন করলেন—কোথায়?

—সেই অনাত্মীয়া মহিলার কাছে। খোকনকে সারিয়ে তোলার জন্য যে-রকম পুরস্কার পেয়ে তিনি বিদায় নেছেন!……

মহিম দাঁড়ালো না…ত্বরিত পায়ে বেরিয়ে গেল। কর্ণেল চৌধুরী দাঁড়িয়ে রইলেন স্তম্ভিত নির্ব্বাক… যেন পাথরের মূর্ত্তি!

…রাজ্যের কৌতূহল নিয়ে সতর্কিত পায়ে ললিতা এসে দাঁড়ালো… বললে—কি তোমাদের বকাবকি হচ্ছিল, বাবা?

একটা নিশ্বাস ফেলে কর্ণেল বললেন—বকাবকি নয়, লিলি। আমাদের ভয়ানক অন্যায় হয়েছে…আমরা অপরাধী… মেয়েটিকে এমন করে' অপমান…এত-বড় অবিচার…

ললিতার ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। ললিতা বললে—ও জামাইয়ের দুটো মিষ্টি কথা শুনে…

কঠিন দৃষ্টিতে কর্ণেল চৌধুরী চাইলেন ললিতার পানে…বললেন—লিলি…

ললিতার কুঞ্চিত ভ্রূ…কর্ণেল বললেন,—তোমাদের এই সব

ছেলেমানুষী···ছি, ছি···একখানা চিঠির উপর নির্ভর করে' · আর এক-জনের উপর এত-বড় অবিচার! সত্য,···অনাত্মীয়া মহিলা হলেই এমন ইতর সন্দেহ...

ললিতা বললে—সাফাই দিতে মিষ্টি কথা বলা···তোমার জামাই ওতে খুব ওস্তাদ।

কর্ণেল চৌধুরী রূঢ় স্বরে ডাকলেন—লিলি···

ললিতা বললে—তুমি ওতে ভুললেও আমি ভুলিনা। আমি ওকে চিনি! বলে' ললিতা দাঁড়ালো না···দুম্‌দুম্‌ শব্দে ঘর থেকে চলে গেল। কর্ণেল চৌধুরী দাঁড়িয়ে রইলেন তেমনি নির্ব্বাক···স্তম্ভিত··· পাথরের মূর্ত্তির মতো।

মহিম গিয়ে দেখা করলো শিবানীর সঙ্গে···শিবানী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার সেই ঘরটিতে খোলা জানলার সামনে। ঘরে ল্যাম্প নেই···চাঁদের জ্যোৎস্না লুটিয়ে পড়েছে। সেই চাঁদ যে-চাঁদ তার মনে ও-বাড়ীতে বিহ্বল কুহকের সৃষ্টি করেছিল···

শিবানী ভাবছিল···

ঘরে ঝড়ের মতো মহিম এসে ঢুকলো···ডাকলো—শিবানী···

শিবানী যেন কেঁপে উঠলো! ফিরে দেখে, মহিম! বললে—মহিমদা···

মহিম শিবানীর হাত ধরলো···পাগলের কণ্ঠে বললে—আমায় ক্ষমা করো শিবানী···তোমার এ লাঞ্ছনা, এ অপমান আমারি জন্য!

শিবানী হাত টেনে নিলে না···মহিমের পানে তাকিয়ে মলিন মৃদু-হাস্যে বললে—ক্ষমা কিসের মহিমদা? হয়তো আমারি অন্যায়

হয়েছিল তোমার ওখানে থাকা। দুঃখ করো না··সব মানুষ তো সকলকে চেনে না···বোঝেও না। সাধারণ মানুষের মতো ওঁরা যদি ভুল বুঝে থাকেন···

মহিম বললে—ওঁদের সেই ভুল-বোঝাকে মেনে নিতে হবে? নিজেদের ছোট মন নিয়ে অপরকে যারা ছোট ভাবে···

বাধা দিয়ে মিষ্ট মধুর মৃদু হাস্যে শিবানী বললে—কিন্তু কার সঙ্গে তুমি তর্ক করবে মহিমদা? তোমার স্ত্রী···

মহিমের বুকের মধ্যে যেন সাগর ফুঁশছিল! মহিম বললে—স্ত্রী! মন্ত্র পড়ে বিবাহ করেছি···সে-মন্ত্রের মর্য্যাদা রাখতে কী না সয়েছি আমি ···বাষ্পোচ্ছ্বাসে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো মহিমের। মহিম বললে—সহ্য করবার একটা সীমা আছে শিবানী···

শিবানী অনেক বুঝোলো···বললে—অবুঝ হয়ো না মহিমদা··· খোকনের কথা ভেবে, খোকনের মুখ চেয়ে তোমাকে সব সহ্য করতে হবে। অসহ্য বললে তোমার চলবে না। যাও, বাড়ী যাও। তোমায় সত্য বলছি, আমি কিছু মনে করিনি···কোনো দুঃখ নেই আমার···তুমি ভালো থাকো, খোকন ভালো থাকুক···এই কামনা নিয়ে আমি পরম আনন্দে থাকবো। বাড়ী যাও, লক্ষ্মী ভাই···

মহিম আর পারে না! মাথার মধ্যে যেন আগুনের চাকা ঘুরছে ···মহিম বসে পড়লো·· বললে—কিন্তু ··

শিবানী বললে—না, কিন্তু নয়। বাড়ী যাও। আমার কথা শোনো।

মহিম নিশ্বাস ফেললো। শিবানী কোনো মতে নিশ্বাস চেপে গাঢ় কণ্ঠে বললে—মানুষ স্বপ্ন দেখে···সুস্বপ্ন·· দুঃস্বপ্ন···দুই। সে স্বপ্ন আবার ভুলে যায়। আমাকেও তেমনি ভুলে যেয়ো মহিমদা···মনে করো,

সেবারকার সেই দুর্য্যোগের মতো আজও এ-দুর্য্যোগের রাতে আবার কোথা মিলিয়ে গেছে শিবানী !

মহিমের দুচোখে জল ঝক্-ঝক্ করছে···শিবানী লক্ষ্য করলো। বুকখানা তার ভেঙ্গে যেন চূর্ণ হয়ে যাবে! প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে রুখে মহিমের পিঠে হাত রেখে শিবানী বললে—যাও মহিমদা···

মহিম আর কোনো কথা বললে না···প্রতিবাদ নয়, আপত্তি নয়··· নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল···মাতালের মতো টলতে টলতে।

শিবানী চোখের জল ধরে' রাখতে পারলো না···জানলার ধারে দাঁড়িয়ে···দুচোখ ঝাপসা···

রাজেন এসে ডাকলো,—শিবানী···

শিবানী ফিরলো। ঘরে আলো ছিল না···রাজেন বললে—মহিম এসেছিলেন ?

গাঢ় কণ্ঠে শিবানী জবাব দিলে,—হুঁ···

রাজেন বুঝলো, বললে—কাঁদচো! ছি শিবানী, ভুলে যেয়োনা, আমাদের হাসি নয়, চোখের জল নয়···কিছু নয়। তাছাড়া এখন কাঁদবার সময় নেই! ডাক এসেছে। এখনি যেতে হবে···

শিবানী বললে,—কোথায় ?

—বোধ হয়, ভারতের বাইরে! আই-এন্-এ···

শিবানী স্থির গম্ভীর···নীচে পথে হঠাৎ বাঁশী বাজলো !

উৎকর্ণ হয়ে রাজেন বললে—পুলিশের বাঁশী !

জানলা দিয়ে সন্তর্পণে তাকালো পথের পানে···দেখে তখনি বললে—পুলিশ! শীগগির···শীগগির সরে যেতে হবে···সব নিশ্চিহ্ন করে'···পিছন-দিককার ভাঙ্গা পাঁচিল টোপকে···দু-মিনিটের মধ্যে সাফ···

পরের দিন সকালবেলা…মহিম কল্-এ বেরুবে, এমন সময় পুলিশ-অফিসার এসে দেখা দিলেন…এস্-বী পুলিশ।

শিবানী আর রাজেনের সম্বন্ধে লক্ষ প্রশ্ন…

বিরক্ত হয়ে মহিম বললে—কিন্তু আমাকে এ সব প্রশ্ন করার মানে বুঝি না।

অফিসার বললেন—মানে, ওদের ঐ বস্তীর সামনে আপনার গাড়ী দেখা গেছে হামেশা। তাছাড়া ওখানে আপনার যাতায়াত ছিল বলে ইন্‌ফরমেশন পেয়েছি।

মহিম বললে—আর কোনো ইন্‌ফরমেশন পেয়েছেন ?

অফিসার বললেন—শিবানী দেবী ঐ বস্তীতেই থাকতেন…এবং আপনার বাড়ীতেও তিনি এসে বাস করেছেন কিছু-কাল।

মহিম বললে—হুঁ…তার পর ?

—মানে, আপনি তাহলে ওঁদের ভালো রকমই চিনতেন! তাই জিজ্ঞাসা করছি, দলের লোকজন কি সব কাজ-কর্ম করতেন, বলতে পারেন ?

ভ্রূ কুঞ্চিত করে' মহিম বললে—এমন কোনো মন্দ কাজ করতেন বলে' জানি না, যার জন্য লর্ড সিন্‌হা রোডে বসে' আপনারা চঞ্চল হতে পারেন!

—দেখুন, আপনি ওদের বাইরের নিরীহ খোলশটাই শুধু দেখেছেন ডক্টর রায়…আসলে ঐ বস্তীটা ছিল বিপ্লবীদের আড্ডা… রেগুলার রেভলিউশনারি ডেন্!

শ্লেষ-ভরে মহিম বললে—বটে! আপনার কাছে তাহলে মস্ত একটা শুভ-সংবাদ শুনলুম!

অফিসার বললেন—ওঁরা এখন কোথায়, আপনি জানেন ?

—কেন, যথাস্থানে !

—না। ওদের কাকেও সেখানে পাওয়া যাচ্ছে না···কাল থেকে সব ফেরার।

—ফেরার !

—আজ্ঞে, হ্যাঁ···কোনো পাত্তা নেই ! আপনি জানেন···

মহিমের আর ধৈর্য্য রইলো না। মহিম বললে—কেন আমার সময় নষ্ট করছেন···মিছিমিছি ! যেটুকু আমি বলেছি, তার বেশী বলবার কিছু নেই আর আমার।

অফিসার লোকটি অসম-সাহসিক নন, দুরাত্মাও নন···নোট-বুক পকেটে রেখে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—আপনি বিরক্ত হচ্ছেন ! কিন্তু উপায় কি বলুন ! চাকরি অর্থাৎ ডিউটি ইজ ডিউটি। আচ্ছা আসি, ক্ষমা করবেন। নমস্কার !

মহিম বললে—নমস্কার···

অফিসার চলে গেলেন। মহিম একেবারে থ ! তাদের কোনো পাত্তা নেই ? তাইতো ! শিবানী তার কোনো আভাস দিলে না কেন ? বললে, মনে করো, দুর্য্যোগের অন্ধকারে মিলিয়ে গেছি···

বিস্ময়ে মহিম বিমূঢ়···

কর্ণেল চৌধুরী এসে ডাকলেন—মহিম···

মহিম তাকালো তাঁর পানে।

কর্ণেল চৌধুরী বললেন—কাল সারা রাত আমি ঘুমোতে পারিনি, কেবলই ভেবেছি মহিম। ভদ্র-মহিলাকে এমন করে' অপমান···অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। আমি নিজে তাঁর কাছে যাবো···ক্ষমা চাইবো ! পারো আমাকে তাঁর ওখানে নিয়ে যেতে ?

গম্ভীর কণ্ঠে মহিম বললে—যাবার প্রয়োজন নেই !

—প্রয়োজন নেই ?

—না। তিনি চলে গেছেন।

—চলে গেছেন! কোথায়?

—জানি না!

—ও···

নিরুপায় দৃষ্টিতে কর্ণেল চৌধুরী চাইলেন মহিমের পানে। মহিম ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বেরিয়ে সে গেল সেই বস্তীতে। সেখানে বেশ জটলা। খবর পেলো, চায়ের দোকানে ছিল কে ইন্‌ফর্মার···চুরি করে' বহুবার [illegible] খেটে এসেছে···এখনে রাত্রে মদ বেচ্‌ছিল···রাজেনের শাসনে তার সে লাভের ব্যবসা হয়েছে বন্ধ···আক্রোশে তাই সে পুলিশে গিয়ে খবর দেছে, স্বদেশীওলারা বস্তীতে বসে বোমা তৈরী করে! তার দেওয়া সে-খবরে পুলিশ এসে রাত্রে হানা দিয়েছিল···কিন্তু কাকেও পায়নি। পুলিশ আসছে খবর পেয়েই সকলে ভেগেছে।

সে ইন্‌ফর্মারের সঙ্গেও দেখা হলো। সগর্বে সে এ-কাহিনী প্রচার করছিল।

দেখা হলো বস্তীর মালিকের সঙ্গে। বোমার আগুনে সব ছারখার হয়ে যাবে বলে' সে-বেচারী বস্তীর জমি-ঘর সব বেচে নবদ্বীপে [illegible]রে পড়বে, সব পাকা···খদ্দের বায়নার তারিখ ঠিক করেছে, এমন সময় এই বিভ্রাট। দাগী বাড়ী শুনে খদ্দের ভেগেছে! লোকটা কপালে হাত দিয়ে হায়-হায় করতে লাগলো।

মহিম তাকে ধরলো···বললে, মহিম চায় এ-বস্তী কিনতে।

হুঁ! মালিক যেন আকাশের চাঁদ পেলো হাতে। যঃ পলায়তি! সে স্থির জানে যে বোমার উৎপাতে কোন্ দিন জাপানীরা বস্তী গুঁড়ো

করে' দেবে···নয় ইংরেজরা পালাবার সময় নাকি সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে যাবে···এ-খবর তার কে বন্ধু কেল্লা থেকে শুনে এসেছে!···ভাবলো, বাঁচা গেল, টাকা পাবে···টাকা থাকলে আবার বাড়ী কিনবে!

হপ্তা-খানেকের মধ্যে মহিম বস্তী কিনলো···কিনে সেখানে গড়া সুরু করলো সেবা-সদন।

তৃতীয় অধ্যায়

১

ওদিকে এক নূতন জীবন! ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের স্বপ্ন···প্রাণ পণ করে' সংগ্রাম। বর্ম্মার প্রান্তর···পেনাঙ, সিঙ্গাপুর···যেন এ-পাড়া ও-পাড়া! কামানের গোলার সামনে এগিয়ে যাওয়া যেন কলকাতার মাঠে ফুটবল খেলা···গোল্ দিতে হবে! দিতেই হবে···হারা চলবে না!···এ-সংগ্রামে পিছু হঠা হবে না···এক তিল পদস্খলন নয়। যত দিন না স্বাধীনতা লাভ হয়···ততদিন! বিরাম নেই! সংগ্রামের পথে এগিয়ে চলতে হবে। সকলে সৈনিক। সৈনিক ছাড়া আর অন্য পরিচয় কারো নেই।

মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে সমরাঙ্গনে নেমেছে···হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ-খৃষ্টান সব আজ এক। সকলের ধর্ম্ম আজ দেশ-মাতৃকার বন্ধন-পাশ-মুক্তি! সকলের এক জাত—সকলে ভারত-সন্তান।

নেতাজীর আশ্বাস-বাণী সকলের প্রাণে জাগন্ত জীবন্ত উৎসাহ সঞ্চারিত করেছে! মৃত্যু যেন খেলার সাথী···মৃত্যুকে জয় করে' সকলে চলবে। নতুন আশায় নতুন আলোয় ভর করে' সকলে চলেছে এগিয়ে—লক্ষ্য, দিল্লীর লাল কেল্লা!·· দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কোথা দিয়ে চলে যাচ্ছে···মন কেবলি বলছে, এবার···এবার···

যে কাজে যখন যার ডাক পড়ে···বন্দুকের গোলার মতো নির্ভীক ছুটে যায় রণাঙ্গনে। ডিউটির পর ডিউটি বদলাচ্ছে। আজ এখানে, কাল সেখানে! আশ্চর্য্য সুশৃঙ্খল ধারায় কাজ চলেছে···সকলে যেন নতুন কাঠামো নিয়ে নতুন মানুষ হয়ে উঠেছে!

ট্রেঞ্চের মধ্যে রেড-ক্রশের ক্যাম্প। শিবানী সেখানে [illegible]ল্ড-নার্শ।

গ্রামের কোণে ভীরু মন নিয়ে যে বাস করতো···[illegible] পৃথিবী আজ যেন তার খেলার ঘর! তার যেমন সাহস, তেমনি নিষ্ঠা!

রাজেন ফৌজের দলে। তারো ডিউটি পড়েছে এখন এই ক্যাম্পে। দুজনে পাশাপাশি কাজ করছে।

হঠাৎ দুজনের ডাক এলো এসপিয়নেজ-ক্যাম্প ফাইভ্ থেকে·

রাজেন আর শিবানী গিয়ে দাঁড়ালো অফিসার মেজর গুপ্তর [illegible]ন। গুপ্ত বললেন,—তোমরা কলকাতার মানুষ · গুরু দায়িত্বের [illegible] দিচ্ছি তোমাদের হাতে। বললেন,—দায়িত্ব-পালনে তোমাদের শক্তির পরিচয় পেয়েছি, তাই তোমাদের ডেকেছি। ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য ভারতের বাইরে সংগ্রাম চালাবার সঙ্গে সঙ্গে চাই ভারতের ঘরে ঘরে ভারতবাসীকে শোনানো নেতাজীর মন্ত্র। সে মন্ত্রে তাদের দীক্ষা দিতে হবে। সেই দীক্ষার মন্ত্র নিয়ে তোমাদের এখনি যেতে হবে ভারতবর্ষে কলকাতা সহরে। বংশী বড়াল লেন সতেরো নম্বর বাড়ীতে পাণের

দোকান·· শিক্ষিত বাঙালীর পাণের দোকান···সেই দোকানে। সঙ্কেতে পরিচয় বুঝে পাণওয়ালার হাতে দিতে হবে প্যাকেট। বর্ম্মা থেকে রেফুজীরা চলেছে . রেফুজীর বেশে যাবে··ধরা পড়া চলবেনা। যদি ধরা পড়ো, প্যাকেট নষ্ট করবে··চিহ্ন কেউ যেন না পায়!

দুজনে তখনি যাত্রা করলো···রেফুজীদের দলে মিশে রেফুজীর বেশে।

দেখলো, সকলের দুঃখ কষ্ট, ব্যথা বেদনা, আশা-নিরাশা·· জীবন-মরণের কি সে লীলা!

দুজনে এলো সকলের সঙ্গে মিশে ভারতের সীমানায়···

সামনে তারের বেড়া। ফৌজের লোক সকলের তল্লাশ নিচ্ছে··· যার উপর এতটুকু সন্দেহ, তাকেই করছে গুলি···জন্তু-জানোয়ারকে যেমন গুলি করে, তেমনি করে'!

রাজেন শিবানী—দুজনে সতর্ক হয়ে চলেছে···হঠাৎ ফৌজদারের মনে সংশয়। রাজেন বুঝলো, ইঙ্গিতে শিবানীকে জানালো,—বাঁকা পথ···জঙ্গলে ঢুকে···

দুজনে তখনি চললো জঙ্গলের দিকে···হুঁশিয়ার হয়ে।

ফৌজদারের গুলি এসে লাগলো রাজেনের পায়ে। ক্ষণেকের চাঞ্চল্য···ঝোপের মধ্যে বসে পড়লো রাজেন, শিবানীকে বললে—সরে পড়ো·· দূরে। আমার জন্য ভেবোনা। চুপচাপ থাকতে হবে খানিক···

এমনি করে জঙ্গলের আড়াল দিয়ে চললো···মাটীতে বুক দিয়ে সাপের ভঙ্গীতে চললো অনেক দূর···তারপর বসলো উবু হয়ে—বসে পায়ের জখমে কাপড় বাঁধলো···যদি রক্ত থামে।

তারপরে আবার চলা।

দু-তিন ঘণ্টা পরে নিরাপদ জায়গা···তখন ব্যাণ্ডেজ খুলে অবসর

মিললো পায়ের পানে তাকাতে। বাঁ পায়ের নীচেটা ছিঁ[illegible]ছে··· দর-দর ধারে রক্ত ঝরছে।

শিবানী ব্যস্ত হয়ে জল দিলে কাটা ঘায়ে···তারপর আঁচল ছিঁড়ে পায়ে দিলে ভালো করে' ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে। বললে—এখানে ভয় নেই। একটু বিশ্রাম করো রাজেনদা...

—না, না, না! রাজেন হুঙ্কার তুললো—বিশ্রামের সময় নেই। যে কাজের ভার নিয়েছি, সে ভার নামাবার আগে বিশ্রাম নয়। বিশ্রামের কথা ভাবা নয়। চলো, চলো ঐদিকে চলো, শিবানী···

রণক্ষেত্রে হলেও শিবানী মেয়ে···বাঙলা দেশের মমতা[illegible]য়ে··· শিবানী বললে—কিন্তু তোমার পা?

—পা চলবে···চলার বশে ঠিক চলবে। জিরেন দিলে পা অবশ হয়ে যাবে···আর হয়তো চলতে পারবে না।

দুজনে চললো। এবং চলে চলে···

ষ্টীমার···ট্রেণ···রেফুজীর বেশে কোনোমতে···অবশেষে কলকাতা ···বংশী বড়াল লেন···১৭ নম্বরে পাণের দোকান। প্যাকেট পাণওয়ালার হাতে তুলে দিয়ে রাজেন ফেললো নিশ্বাস।

সন্তর্পণে প্যাকেট নিয়ে পাণওয়ালা রাজেনকে বললে—এখানে দেরী নয়। ফেউ লেগেছে। তাছাড়া দলের অনেক লোক ধরা পড়ে[illegible]। ···ঐ ফেউ আসছে···সরে পড়ো। হুঁশিয়ার!

পা আর চলে না···চলতে চায় না। সেই বুলেটের চোটটা! ওঃ! রাজেন বসলো গলির এক রোয়াকে।

শিবানী বললে—বসলে যে?

—পা আর চলে না…দেহটাকে লুটিয়ে দিতে পারলে আরাম মেলে যেন !

শিবানী বললে—কিন্তু সে লোকটা ?

—পিছনে আসছে ?

সতর্ক দৃষ্টিতে শিবানী দেখলো…চারিদিকে। না, কারো চিহ্ন নেই। গলিতে শুধু তারা দুজন…কালো মুখোস এঁটে গ্যাসপোষ্টগুলো দাঁড়িয়ে আছে যেন ব্ল্যাক মার্কেটিয়াররা।

শিবানী বললে,—না, কাকেও দেখছি না।

রাজেন বললে—শুনে এলে তো হরিদাস মিত্তিররা ধরা পড়েছে !

—হুঁ…

রাজেন বললে—একসঙ্গে আমাদের আর থাকা চলবে না শিবানী …দুজনকে দু'পথ ধরতে হবে।

—তার মানে ?

—আমাদের নামে বৃটীশ সরকারের পরোয়ানা আছে… আই-এন্ -এর লোক আমরা। ধরলে সাজা…জেল।

নিশ্বাস ফেলে শিবানী বললে—জেলে যাবো।

—পাগল ! এখন জেলে যাওয়ার মানে, সব কাজ পণ্ড !

শিবানী বললে—তা বলে তোমাকে এ অবস্থায় ফেলে আমি যাবো না রাজেনদা !

—যেতেই হবে শিবানী। এখন আমি অক্ষম, তোমার বোঝা। আমাদের কাজ লড়াই করা, বোঝা বহা নয়।

শিবানী চেয়ে আছে রাজেনের পানে…দু'চোখের দৃষ্টি অবিচল।

রাজেন বললে—তাছাড়া ভুল করোনা শিবানী, আমাদের কাজ—অবিচার, অত্যাচার, অভাব, দারিদ্র্য, অভিযোগের সঙ্গে লড়াই ! লড়াই করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে… কোথায় কে সঙ্গী সাথীবন্ধু

আত্মীয় চোট খেয়ে পথে পড়লো…কি প্রাণ হারালো, তাদের নিয়ে হা-হুতাশ করতে বসলে লড়াই বন্ধ হবে, পরাজয় অনিবার্য্য। আমি অক্ষম পড়ে থাকবো বলে' তুমি আমার পাশে বসে আমায় চৌকি দেবে না! তোমার কাজ বাকী…কাজ করতে হবে!

শিবানী নিশ্বাস ফেলে বললে—কি নিষ্ঠুর তুমি রাজেনদা!

রাজেন বললে—কর্ত্তব্য চিরদিন নিষ্ঠুর বোন।…একা নিজেকে আমি কোনরকমে ঠিক চালিয়ে নিতে পারবো। তুমি থাকলেই হাজার চিন্তা! কাজেই আমায় ছেড়ে তোমাকে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে।

—নিরাপদ আশ্রয়!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিরাপদ আশ্রয়।

—তেমন আশ্রয় আমার কোথায় আছে, বলতে পারো রাজেনদা?

রাজেন চাইলো শিবানীর পানে! এক সেকেণ্ড চুপ করে রইলো; তারপর বললে—পৃথিবীকে এত ছোট করে' দেখো না শিবানী—কোথাও তোমার আশ্রয় নেই পৃথিবীতে?

শিবানীর বুকখানা ধ্বক্ করে উঠলো! কলকাতায় এসে অবধি যে-কথা তার মনে সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে…
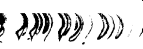
শিবানী বললে—বুঝেছি…কিন্তু আমার জন্য মহিমদাকে আমি এতটুকু অশান্তি দিতে পারবো না, রাজেনদা।

—অশান্তি!

—হ্যাঁ। তুমি তো জানো, কেন আমি সে-আশ্রয় ছেড়ে এসেছি।

—জানি। তবু তোমায় সেইখানেই যেতে হবে। ঝড়ের মুখে পাল তুলে চলেছি আমরা শিবানী, মান-অভিমান মনে পুষে রাখবার অবকাশ আমাদের নেই! মহিমের কাছেই তোমায় যেতে হবে। তার চেয়ে বড় বন্ধু তোমার আর কেউ নেই আজ।

শিবানীর [illegible]

কোথা থেকে ভেসে এলো কবে-শোনা মহিমের সেই [illegible]
আলোয় ছিল চারিদিক ভরে···বারান্দায় সে আর মহিম···মহিম বলেছিল, তোমার চেয়ে বড় বন্ধু পৃথিবীতে আমার কেউ নেই শিবানী!

সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠলো! রাজেনদার মুখেও এই কথা! বুকের মধ্যে নিশ্বাস উত্তাল হয়ে উঠলো! শিবানীর মুখে কথা ফুটলো না।

রাজেন বললে—অবুঝ হয়ো না শিবানী··আমার জন্য মিথ্যা তোমার ভাবনা।···আমিও বাঁচতে চাই··দেশকে স্বাধীন দেখবো, জীবনে এই একটী মাত্র কামনা। তুমি ভাবো, সে কামনা নিষ্ফল রেখে আমি মরবো? না, যাদের দেখে গিয়েছিলুম অন্নাভাবে কাঁদছে··· দেখতে চাই, আহার পেয়ে স্বচ্ছন্দে তারা পুষ্ট হয়ে উঠেছে। আমি মরবো না। তুমি চলে গেলে আমার পায়ের চিকিৎসা আমি করাবো, সেবা করাবো। সেবায় চিকিৎসায় যেমন করে পারি, আমি সেরে উঠবো কিন্তু তুমি সঙ্গে থাকলে আমার দুর্ভোগের সীমা থাকবে না।

একটা কথা শিবানীর মনে উদয় হলো···দুর্য্যোগে যেন দীপ্তি ফুটলো!

শিবানী বললে—বেশ, তোমার কথা রাখবো, আমি যাবো মহিমদার কাছে, তোমাকেও আমার একটি অনুরোধ রাখতে হবে রাজেনদা।

রাজেন বললে—বলো···

শিবানী বললে—আমার সঙ্গে তুমিও একবার মহিমদার সঙ্গে দেখা করো···তোমার পায়ের সম্বন্ধে তিনি যদি কোনো ব্যবস্থা করেন, আমি তাহলে নিশ্চিন্ত হতে পারবো।

রাজেন হাসলো, বললে—বেশ, কিন্তু···

শিবানী বললে—যেখানে খুশী যেয়ো…তবে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে থেকো না।

তারপর ভাবলো, মহিমের বাড়ীতে হঠাৎ গিয়ে উদয় হবে? সেই ঘটনা…

রাজেন বললে—জানি, কি ভাবছো…বেশ, ঐ ডিস্‌পেন্সারি থেকে ফোন্ করে তাঁকে খপর দাও আগে…

শিবানী চাইলো রাজেনের পানে।

রাজেন বললে—যাও…আমি এইখানে বসি…এই রোয়াকে।

শিবানী ঢুকলো ডিস্‌পেন্সারীতে…ফোন্ করলো—ডক্টর রয়…

মহিম ধরলো রিসিভার। বললে—কে?

—আমি শিবানী…ফোন্ করছি।

শিবানী! মহিম অবাক! বললে—তুমি কোথা থেকে?

শিবানী বললে—যেখান থেকেই ডাকি…রাজেনদা খুব অসুস্থ… তাকে একবার দেখতে হবে। কোথায় গেলে তোমার সুবিধা হবে?

—সুবিধা! মহিম বললে—সেই বস্তীতে যাও। এখন আর বস্তী নেই। দেখবে, ক্লিনিক্‌স্…সেখানে গিয়ে আমার নাম করো… কোনো ভাবনা নেই…আমিও এখনি যাচ্ছি…হয়তো তোমরা যেতে না যেতেই পৌঁছুবো।

—আচ্ছা।

ক্লিনিকে মহিম এলো। রাজেন আর শিবানী একটু আগে এসে পৌঁচেছে।

ভালো করে পা দেখা হলো।

মহিম বললে—গুলিটা পা ঘেঁষে খুব বেরিয়ে গেছে…পায়ে যদি বিঁধতো?

হেসে রাজেন বললে—নেহাৎ ছোটলোক। মাথা ছুঁতে পারলো না··পায়ে লুটিয়ে পড়লো! তাও শুধু ঐ স্পর্শ!

মহিম বললে—তবু যা দেগে গেছে···একটি মাস বিছানায় থাকতে হবে। নড়ন-চড়ন মোটে নয়। অপারেশন করবো। সেপটিক হয়েছে।

রাজেন বললে—তাতে কি ভয় করি ডাক্তার-সাহেব?

—আজ বিশ্রাম করো রাজেন···কাল সকালে অপারেশন।

রাজেন রইলো শুয়ে। শিবানীকে নিয়ে মহিম হাসপাতাল দেখাতে লাগলো। এটা সার্জিকাল ওয়ার্ড···ওটা ফার্মাসি···ওদিকে মেটার্নিটি ওয়ার্ড। দোতলায় উঠলো···মাঠকোটার সেই ঘর, যে ঘরে শিবানী থাকতো। সে-ঘরখানি যেমন, তেমনি রাখা হয়েছে—তার সংস্কার হয়নি···সেই দড়ির খাটিয়া, সেই টেবিল···

মহিম বললে—এই ঘরে আমি বসি।

শিবানী শুনলো, নিশ্বাস চেপে ডাকলো,—মহিমদা···

মহিম বললে—সেই বোমা পড়ার রাতে এই ঘরে আবার আমি নিজেকে ফিরে পেয়েছি শিবানী···ফিরে পেয়েছি আমাদের ছোট বয়সের সেই সব সোনার স্বপ্ন!

মহিম বললে বৃত্তান্ত। তারা চলে যাবার পর এ-বস্তী মহিম কিনেছে···কিনে এখানে সে হাসপাতাল তৈরী করিয়েছে···নিজের সামর্থ্য-মত···দীন-দুঃখী আর্ত্ত-অনাথদের সেবার কাজ হাতে নেছে ···শিবানী এখন আবার যখন ফিরে এসেছে···

মহিম বললে—তোমাদের কাজ তোমরা আবার হাতে নাও। আমায় শুধু পাশে রেখো শিবানী···তোমাদের কাজে যতটুকু আমি হাত লাগাতে পারি!

শিবানীর বুক ভরে উঠলো। চোখে বাষ্পোচ্ছ্বাস। জড়িত কণ্ঠে শিবানী বললে,—মহিমদা···তুমি কত বড়, আজ তা জানলুম! এ—কাজে তোমাকে পাওয়া···কতখানি সৌভাগ্য! কিন্তু···

—কিন্তু কিসের শিবানী?

শিবানী বললে—আমাদের নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা আছে। আমরা আই-এন-এর দলে ছিলুম···

মহিম বললে—সে কথা কেউ জানবেনা। এখানকার সকলের দিদিমণি তুমি···তাছাড়া তোমার আর অন্য পরিচয় নেই। পুলিশ? পুলিশ বিন্দু-বিসর্গ জানবে না, সে সম্বন্ধে নিশিন্ত থাকো···সেদিকে আমারো লক্ষ্য থাকবে!

২

জীবনে বৈচিত্র্য এলো···আনন্দ এলো। মেশিনের মতো কাজ করছিল মহিম, এখন এ কাজে হলো প্রাণের সংযোগ। শক্তি তার অনেকখানি বেড়ে উঠলো।

শিবানী বলে—খোকন?

মহিম বলে—লেখাপড়া করছে···আমি তাকে দেখছি।

—আমাকে খোঁজে?

—খোঁজে। আমি বলি, বড় হলে, লেখাপড়া শিখলে আবার তুমি আসবে।

—তার সেদিনের সে কথা এখনো আমার মনে বাজছে, মহিমদা! ···দেখবার এত ইচ্ছা হয়···কিন্তু ভয় করে।

মহিম বললে—মিছে অশান্তি সৃষ্টি করে লাভ কি? সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।

—হুঁ।

ললিতা তেমনি আছে। বন্ধু-বান্ধবী···সিনেমা, বিলাস-প্রসাধন··· তার মনে মস্ত শান্তি, শিবানী এখানে নেই···বস্তী উঠে গেছে··· সেখানে আজ সেবা-সদন। মহিম সেবা-সদনে যায়, জানে···ডাক্তার-মানুষ তাই যায় গ্রাহ্য করে না! জানে, মহিম অনেক টাকা খরচ করেছে ঐ সেবা-সদন গড়ে তুলতে! ললিতা বলেছিল রোজগারের টাকা ওখানে ঢালছে', পাঁচ ভূতে এর পরে···

মহিম সে-কথার জবাব দেয় নি।

ললিতা বলেছিল—কালিম্পঙে ভালো জায়গা আর জমি বিক্রী আছে··

মহিম জবাব দিয়েছিল—শুধু কালিমপঙ কেন? কত জায়গায় আরো ভালো-ভালো কত জমি আছে···সব নিতে হবে?

ললিতা ভ্রূ-কুঞ্চিত করে' বলেছিল—কি কথার কি জবাব!

মহিম তারো জবাব দেয় নি···কথায় কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

বান্ধবী আভা সেদিন রিং করছিল,—ভালো এক-খানা ছবি আছে গেইটিতে···ডক্টর রায়কে আর তোকে নিয়ে যাবো।

ললিতা বললে—আচ্ছা।

বিকেলে প্রসাধন করতে চলেছে, মহিমের সঙ্গে দেখা—ড্রয়ার থেকে একখানা প্ল্যান টেনে নিয়ে মহিম বেরুবার উদ্যোগ করছিল!

ললিতা বললে—কোথায় চলেছো?

—এঞ্জিনীয়ারের কাছে।

—কোথায় বাড়ী তৈরী হচ্ছে?

—সেবা-সদনে কতকগুলো এক্সটেন্‌শন হবে, তারি প্ল্যান নিয়ে যাচ্ছি। কাজটা শীগগির শেষ করলে হবে।

—আবার ঐ সেবা-স... পয়সা তো ছিল না কখনো, পয়সার দাম বুঝবে কেন?

মহিম চলে যাচ্ছিল নিরুত্তরে, ললিতা বললে—আভা বলছিল, সিনেমায় যাবে।

—আমার সময় হবে না লিলি। এঞ্জিনীয়ার কাল সকালে দিল্লী যাচ্ছেন।

—ও!

মহিম ঢুকলো ও-ঘরে · ল্যাণ্ডিংয়ে ফোন···ড়িং ড়িং ড়িং!

ললিতা ধরলো রিসিভার,—হ্যালো···

জবাব ঃ—ডক্টর রয় আছেন? সেবা-সদন থেকে বলছি।

ললিতা খবর দিলো মহিমকে,—ফোনে তোমায় ডাকছে···একটি মেয়ে···সেবা-সদন থেকে।

মহিম এলো, এসে রিসিভার নিলে। ডাকলো,—হ্যালো···

ললিতা কাছে ছিল। ওদিকে থেকে যে-কথা হলো, তাতে মহিম ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে—পুলিশ! ভয় নেই, শিবানী। আমি এখনি যাচ্ছি···এখনি।

রিসিভার রেখে মহিম যাবে, পথ আটকে দাঁড়ালো ললিতা।

—কোথায় চলেছো?

—সেবা-সদন।

—এঞ্জিনীয়ারের কাছে?

—এ তার চেয়ে জরুরী কাজ···শিবানীর বিপদ।

—শিবানী!

—হ্যাঁ।

মহিম ভুলে গেল স্থান কাল পাত্র। বললে,—আই-এন-এ এতে ছিল শিবানী আর রাজেন…ওখানে আশ্রয় নিয়েছিল…পুলিশ বুঝি সন্ধান পেয়েছে।

মহিম নামলো সিঁড়িতে…ললিতার বুকে জাগলো নৃমুণ্ডমালিনী!

রিসিভার তুলে ললিতা ডাকলো—বালিগঞ্জ পুলিশ-ষ্টেশন…

—হ্যালো…হ্যালো…হ্যালো…

মহিম থমকে দাঁড়ালো।

শুনলো,—ললিতা বলছে, হ্যাঁ…হ্যাঁ…আমি বলছি বালিগঞ্জ প্লেস থেকে…ডক্টর মহিম রায়ের বাড়ী থেকে…আপনাদের আসামী…আই-এন-এর শিবানী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানে আসুন, ধরিয়ে দেবো।

মহিম সহ্য করতে পারলো না, ছুটে এলো ল্যাণ্ডিংয়ে; বললে—কি করছো ললিতা!

—করছি যা আমার খুশী!

—জানো, এর ফলে…?

—জেল। তাই আমি চাই। শিবানী আবার এসেছে। আবার তোমাদের প্রেমের রঙ্গ…তাই সেবা-সদনে এত অনুরাগ…তোমার শিবানীর স্মৃতি-তীর্থ…

রিসিভার হাতে ললিতা বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে আছে এখন…

মহিমের চোখের সামনে রাশি-রাশি অন্ধকার! সে অন্ধকার থেকে একটা কালো দৈত্য যেন…

—ললিতা! বলে' মহিম গেল, রিসিভার ছিনিয়ে নিতে পারলো না,—তারপর ললিতার হাত ধরে টানলো।

কোথা দিয়ে কি যে হয়! সে-টানে ললিতা ছিটকে পড়লো সিঁড়ির

ধারে জুতোর হিল হোড়কে··তারপর গড়াতে গড়াতে একেবারে সিঁড়ির তলায়।

মহিম দাঁড়িয়ে দেখলো···চিত্রার্পিত দৃষ্টি···তারপর ধীরে ধীরে নেমে এলো···পাল্‌স্‌ দেখলো···গায়ে হাত দিলে···

প্রাণহীন দেহ !

ল্যাণ্ডিংয়ে চ্যাচামেচি শুনে দাসী-চাকরের দল ছুটে এসেছিল। তারাও দেখলো···

থানার অফিস। বড় ইন্‌সপেক্টর রিসিভার ধরে ডাকছে—হ্যালো··· হ্যালো···

জবাব নেই ! রিসিভার রেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালো।

জুনিয়র বললে—কি হলো স্যর ?

বড়বাবু বললে—স্ট্রেঞ্জ ! স্মেলিং সামথিং রং ! ফোন করছিলেন এক মহিলা বালিগঞ্জ প্লেস থেকে···ডক্টর মহিম রায়ের বাড়ী থেকে···

জুনিয়র বললে—ডক্টর রায়ের বাড়ী থেকে ?

—হ্যাঁ। তারপর কি যে ঘটলো···

অফিসার ডাকলো,—হাবিলদার···

জমাদার এসে সেলাম করে দাঁড়ালো।

বড় অফিসার বললে—আও হামারা সাথ – বালিগঞ্জ প্লেস।

মহিম বললে – এসেছেন ! শী ইজ ষ্টোন ডেড···

— মার্ডার ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু···মানে, কে ? কাকেও সন্দেহ···

মহিম নিজের হাত বাড়িয়ে দিলে, বললে—আমি খুন করেছি আমাকে গ্রেফতার করুন !

আশ্চর্য্য !

কিন্তু আইন ··কঠিন কর্ত্তব্য !

মহিমকে নিয়ে পুলিশ এলো পরে। আশপাশের বাড়ী থেকে রেডিওতে সংবাদ বলছিল—আই-এন-এর বিরুদ্ধে সব অভিযোগ গভর্ণমেণ্ট প্রত্যাহার করেছেন···তাঁরা মুক্তি পাবেন।

মহিম শুনলো। একটা নিশ্বাস ফেলে ভাবলো, যাক, শিবানী তাহলে নিরাপদ !

·

সহরে দারুণ চাঞ্চল্য। এত বড় ডাক্তার মহিম রায়···অমায়িক, বিনয়ী, সকলের উপর মায়া-মমতা···তিনি এমন কাজ করবেন !

একদল লোক বললে—হাই-লাইফ···স্ত্রী সোসাইটি-উয়োম্যান্··· ···নিশ্চয় কিছু !

আর এক-দল বললে,—কিন্তু···

মিথ্যা হলেও মানুসের নামে অপবাদ···নির্বিচারে সকলে বিশ্বাস করে।

মামলার বিচার হলো···প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাস···তারপর আলিপুরের দায়রা।

সেখানে হয়কে নয় করে' নয়কে হয় করে' সাক্ষ্য দিয়ে গেল ফ্যাসনেবল সমাজের নর-নারীরা। অকুণ্ঠ কণ্ঠে তারা বললে···দুজনে অবনিবনা ছিল···শিবানী বলে' একটা মেয়ের জন্যই গণ্ডগোল··· শিবানীকে আর আসামীকে এক-সঙ্গে দেখা গেছে সার্কাসে একই বক্সে···ট্রামে···ষ্টীমারে···

মহিম নির্ব্বাক···উকিল কৌঁশুলী দেয়নি। রাজেন শিবানী বহু মিনতি করেছে, হেসে মহিম জবাব দেছে—না !

দায়রা-জজ তবু বললেন মহিমকে—আপনাকে এখনো চান্স

দিচ্ছি, সাক্ষীদের জবানবন্দী সব শুনেছেন···কাকেও যদি জেরা করতে চান ..

মহিম বললে—প্রয়োজন নেই।···এই হাতে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আমিই অপরাধী···

জুরি স্তম্ভিত। জজ নির্বাক।

আইনের কঠিন কর্ত্তব্য···জুরিদের সঙ্গে এক-মত হয়ে জজ দিলেন দণ্ড—ফাঁশি!

ফাঁশির আগে জেলে গিয়েছিল শিবানী আর রাজেন।

দুজনের নির্বন্ধাতিশয্যে মহিম তাদের জানালো, যা ঘটেছিল।

শুনে শিবানী বললে—এ-কথা কেন তুমি প্রকাশ করে' বললে না, মহিমদা?

মহিম বললে—লাভ?

—তা বলে' এই মিথ্যা কলঙ্ক···

মহিম বললে—কলঙ্কের বিষ আমি অনেকদিন আগেই পান করেছি শিবানী, বিষ পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছি। পলে-পলে নিষ্কৃতি কামনা করছিলুম। আমার সে-কামনা সেদিন দানবের বেশে আমার এই হাতে ভর করেছিল! এতকাল আমার যে-চেতনাকে সজাগ রেখেছিলুম, দানবের স্পর্শে সে-চেতনা হারিয়ে ফেললুম। নাহলে এমন হতো না···

শিবানী বললে—তোমার জীবনের অনেক দাম···সে-জীবন এমন করে'···

—জীবন আমার শেষ হয়ে গেছে সেইদিন, যে-দিন বন্ধুর বেশে কর্ণেল চৌধুরী আমাদের ভাঙ্গা ঘরে গিয়ে উদয় হয়েছিলেন!···ঐশ্বর্য্য মান খ্যাতি···এ-সব কে চেয়েছিল শিবানী? এর চেয়ে আমার সে ভাঙ্গা ঘর···মাথার উপর খোলা আকাশ···সেই সহজ শান্তি···